উন্নয়নে পিকেএসএফ ও মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা

উন্নয়নে পিকেএসএফ ও মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা

২২ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মাননা
এবং
২ জন কৃতী ব্যক্তির স্বীকৃতি

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

প্রকাশকাল
নভেম্বর ২০১৬

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেশক
জনাব মোঃ আবদুল করিম
ড. মোঃ জসীম উদ্দিন

সম্পাদক
অধ্যাপক শফি আহমেদ

সদস্য
মাসুম আল জাকী
শারমিন মৃধা
সাবরীনা সুলতানা

প্রচ্ছদ
অশোক কর্মকার

প্রকাশক
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
পিকেএসএফ ভবন
প্লট- ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
টেলিফোন: ৯১৪০০৫৬-৫৯, ৯১২৬২৪০-৪৩
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১২৬২৪৪
ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org
ওয়েবসাইট: www.pksf-bd.org
ফেসবুক: www.facebook.com/pksf.org

ডিজাইন এবং মুদ্রণ
এ্যাভারগ্রীন প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং

সূচি

সম্পাদকের কথা ০৫

অনুষ্ঠানের কার্যবিবরণী ০৭

স্বাগত বক্তব্য ০৭

বিশেষ অতিথির বক্তব্য ১০

সভাপতির বক্তব্য ১১

প্রধান অতিথির বক্তব্য ১৩

হীড বাংলাদেশ-এর সাংস্কৃতিক দলের উপস্থাপনা ১৫

সম্মাননাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের সার-সংক্ষেপ ১৭

সম্মাননাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যক্তিগত ভাষ্য ২৩

বিশেষ ক্রোড়পত্র: সমাজ উন্নয়নে অবদানের জন্য বিশেষ সম্মাননা প্রদান ৫৮

স্বাগত বক্তব্য ৫৯

বিশেষ সম্মাননাপ্রাপ্ত মিজ পাম থি হং-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ৬১

বিশেষ সম্মাননাপ্রাপ্ত জনাব জামিল চৌধুরীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ৬২

বিশেষ সম্মাননাপ্রাপ্তদের অনুভূতি প্রকাশ ৬৩

বিশেষ অতিথির বক্তব্য ৬৪

সভাপতির বক্তব্য ৬৪

প্রধান অতিথির বক্তব্য ৬৬

সেমিনারের বিষয়ে দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন ৬৮

সম্পাদকের কথা

বাঙালির সর্বকালের সবচেয়ে বড় গৌরব হল ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বিজয়। এই বিজয় থেকে আমরা এখন প্রায় অর্ধশতক দূরত্বে। যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, যারা সেদিনের রক্তাক্ত ইতিকথার সাক্ষী, যারা অবরুদ্ধ দেশে অনিশ্চিত সময়ে কাল যাপন করেছিলেন, যারা শরণার্থী শিবিরের কষ্টকর পরিবেশে দুঃসহ সময় কাটিয়েছেন, তাদের অনেকেই এখনো বেঁচে আছেন। স্মৃতির ঝাঁপি যেন আলাদা করে খুলতে হয় না, স্মৃতিরা সব সামান্য আহবানেই সামনে এসে ভিড় করে দাঁড়ায়। তবুও আজকের সময়ের দূরত্ব থেকে উনিশ শ' একাত্তরকে স্পর্শ করলে মনে হয়, এ যেন এক অনুপম কাহিনী। এমনটি যে কী করে ঘটেছিল, তা ভাবলে গায়ে শিহরণ লাগে, চোখে ঘনায় ঘোর।

এই বর্তমানের সমাজতত্ত্বে বিরোধ, ভিন্নতা আর বিবাদের সংবাদই আমাদের প্রতিদিনের উপজীব্য। দেশটা বড় দু'টি রাজনৈতিক দলের যুধ্যমান শিবিরে বিভক্ত। আক্রমণের বাকতূণ প্রায় প্রতিদিনই নিক্ষিপ্ত হচ্ছে এদিক থেকে ওদিকে, ওদিক থেকে এদিকে। বিবাদ ব্যতীত যেন নিজের অস্তিত্বকে অন্য কোনভাবে প্রকাশ করা যায় না। ধর্মান্ধ জঙ্গিবাদ আমাদের প্রতিদিনের জীবনকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। নিজের স্বাতন্ত্র্যকে জাহির করার জন্য রক্তপাত এখন আর কোন বিস্ময় নয়। অথচ আজ থেকে পঞ্চাশ বছরের কম সময় আগে বাঙালি একতাবদ্ধ হয়ে ফুঁসে উঠেছিল পাকিস্তানী হানাদারদের বিরুদ্ধে। সবাই এক মন এক তান।

'জয় বাংলা' শ্লোগানের কী যাদুকরী শক্তি! সবাইকে আলোড়িত করতো একেবারে পরানের গহীন ভিতর থেকে। সেদিন, ওই একাত্তরে শত্রুর গুলিতে নিহত হবার ঠিক আগের মুহূর্তেও বীর মুক্তিযোদ্ধা 'জয় বাংলা' উচ্চারণ করে বাঙালির মুক্তির অদম্য আকাঙ্ক্ষাকে আকাশপানে ছুঁড়ে দিয়েছিল। কী অদ্ভুত পরিহাস মনে হয়, দেশ স্বাধীন হবার চার বছরেরও কম সময়ে 'জয় বাংলা' শ্লোগান দেবার জন্যই বাঙালিকেই নির্যাতিত হতে হয়েছে অন্যতর বাঙালির হাতে। গায়ে শিহরণ লাগে, একাত্তরের ওই দিনগুলো কি ছিল শুধুই স্বপ্নঘোর?

তাই যদি হবে, তা হলে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং নানা বিঘ্ন বাধা পেরিয়ে আজকের এগিয়ে চলাকে তো মনে হবে গল্প, কোন বৃদ্ধ দাদুর, তিনি আঁধার রাতে কিশোর-কিশোরীদের উদ্দীপ্ত করার জন্য এমন আকাশ-ছোঁয়া গৌরবগাথার অবতারণা করেছেন। তখন, ওই একাত্তর সনে পাকিস্তানীরা বিশেষভাবে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ধ্বংসলীলায় মেতে উঠেছিল, আজও দেখি রাজধানীর অদূরে নাসিরনগরের হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়ি, দেবালয় সব ধ্বংস করে দিচ্ছে এক আসুরিক শক্তি। এ কেমন করে হয় আমাদের এই বাংলায়! মনে পড়ে যায়, একাত্তরের সেই অমর পোস্টার, যাতে জ্বলজ্বলে আখরে লেখা-বাংলার হিন্দু, বাংলার মুসলমান, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার খ্রীষ্টান, আমরা সবাই বাঙালি। সত্যিই তো একাত্তরে আমাদের জাতীয় চেতনার প্রাবল্যে ভেসে গিয়েছিল সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণ ভাবনা। আমরা চাই একাত্তরের চেতনা আবার আমাদের জাগিয়ে তুলুক, ঐক্যের বাঁধন যেন ফিরে আসে।

নিকট অতীতে আমরা তা লক্ষ করেছি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে জাতি একতাবদ্ধ হওয়ার এক মহালগ্ন ফিরে পেয়েছিল। তবে একাত্তরের ঐক্য আর রচিত হয়নি। একটা বড় রাজনৈতিক গোষ্ঠী যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি বিষয়ে নীরব ভূমিকা পালন করেছে। তবে আমরা তো ওই সময়ে দেখেছি গণজাগরণ মঞ্চের উত্থান। আবার লক্ষ কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে অমর 'জয় বাংলা' ধ্বনি। আমাদের সকল কাজে, সকল উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলন ঘটুক, তা-ই আমরা চাই, ওই বীজমন্ত্র আমাদের অস্তিত্ব ও অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) একাত্তরের চেতনায় বিশ্বাস করে। কর্মসংস্থানের মাধ্যমে, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি কর্মোদ্যোগের মাধ্যমে, বিভিন্ন আয়বর্ধক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে, বিশেষত দেশের বিত্তহীন মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে চালিত এই সংস্থা। এমন সব দারিদ্র্য বিমোচনকারী কার্যক্রমের বর্ধমানতা ও সাফল্যের নৈতিক চাবিকাঠি হতে পারে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ। কারণ, মুক্তিযুদ্ধে বিজয় মানে তো শুধু পাকিস্তানী শাসন থেকে মুক্তি নয়, এই বিজয় অর্থ হল ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অবিচার থেকে জনগণের মুক্তি এবং সকল মানুষের জন্য মানব মর্যাদার প্রতিষ্ঠা। পিকেএসএফ জাতির এই লক্ষ্যপূরণে সর্বাত্মক আন্তরিকতার সঙ্গে মানুষকে পাশে নিয়ে কাজ করে।

মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনে এই সংস্থা তার সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে কাজ করার চেষ্টা করছে। একটি পৃথক উদ্যোগ হিসেবে এ বছর পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের মধ্যে যেসব প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের প্রতি সম্মাননা প্রদর্শনে একটি বিশেষ আয়োজন করা হয়েছিল। এমন বাইশজন মুক্তিযোদ্ধা বীরকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। এই স্বল্পপরিসর গ্রন্থে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণী মুদ্রিত হল। এইসব মুক্তিযোদ্ধাদের কথা তাদের নিজেদের ভাষ্যে পরিবেশন করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। তাদের সেই ভাষ্য শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় ভাষাগত সম্পাদনার পর এখানে পত্রস্থ করা হল। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন।

ওই একই অনুষ্ঠানে দু'জন কৃতী ব্যক্তিকে সমাজ উন্নয়নে তাদের বিশেষ অবদানের জন্য সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এদের মধ্যে একজন জামিল চৌধুরী, যিনি বাংলাদেশ ফিমেল একাডেমী প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার মাধ্যমে অসহায় নারীদের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। অন্যজন ভিনদেশী। ভিয়েতনামের নাগরিক মিজ পাম থি হং আমাদের দেশে কাঁকড়া চাষের উন্নততর প্রযুক্তি হস্তান্তরে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। এরা দু'জনই পিকেএসএফ-এর সুহৃদ। তাদের প্রতি আমাদের অভিনন্দন।

শফি আহমেদ

অনুষ্ঠানের কার্যবিবরণী

মুক্তিযোদ্ধা বীরদের সম্মাননা প্রদান

বিগত ২৭ জুলাই ২০১৬ তারিখে **উন্নয়নে পিকেএসএফ-২০১৬** শীর্ষক একটি অনুষ্ঠান পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদের মাননীয় ডেপুটি স্পীকার জনাব মোঃ ফজলে রাব্বি মিয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ-এর সভাপতি মেজর জেনারেল (অবঃ) হেলাল মোর্শেদ খান, বীরবিক্রম। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। পিকেএসএফ-এর পর্ষদ সভার সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দসহ পিকেএসএফ-এর অন্যান্য কর্মকর্তা এবং সহযোগী সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও তাদের কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

স্বাগত বক্তব্য

জনাব মোঃ আবদুল করিম

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম স্বাগত বক্তব্যে প্রথমেই মহান জাতীয় সংসদের মাননীয় ডেপুটি স্পীকারকে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করায় আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ-এর সভাপতির প্রতিও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান করতে পেরে আমরা আনন্দিত ও গৌরবান্বিত বোধ করছি। তিনি বাঙালি জাতির মহান স্থপতি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ

বাঙালি ও জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে মহান মুক্তিযুদ্ধ ছিল এক পরম গৌরবময় অধ্যায় এবং মুক্তিযোদ্ধারা হচ্ছেন দেশের কৃতি সন্তান ও সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধারা জানতেন না কবে দেশ স্বাধীন হবে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ও আহ্বানে মুক্তিযোদ্ধারা জীবন বাজি রেখে মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি বলেন, মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ সশস্ত্র ও সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং ত্যাগ স্বীকার করে এদেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছেন। এজন্য এদেশের মানুষ, অনাগত সকল প্রজন্ম চিরদিন তাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। তিনি বলেন, বিশ্বের কম সংখ্যক জাতি রয়েছে যারা এত স্বল্প সময়ে যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনে সমর্থ হয়েছে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন ভূখণ্ড ও পতাকা উপহার দিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন ও বিনির্মাণে ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধবিরোধী অপশক্তি ও হায়েনারা তাঁকে এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে বাংলাদেশের উদীয়মান উন্নয়নের গতি ও রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে। মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অসংখ্য বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সীমাহীন ত্যাগ ও সংগ্রামের জন্যে তিনি দেশের সকল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ সালাম এবং শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান ও তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। তিনি আরো বলেন, পিকেএসএফ-এর পর্ষদ সভাপতির গতিশীল নেতৃত্বে এবং পিকেএসএফ-এর সংঘবিধি মোতাবেক আর্থিক পরিষেবাসহ সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচির আলোকে পরিচালনা করা হচ্ছে। দারিদ্র্য নিরসনে পিকেএসএফ-এর সুদীর্ঘ পথ চলায় প্রতিষ্ঠাতা সভাপতিসহ যে সকল গুণিজন অব্যাহতভাবে সহায়তা প্রদান করেছেন তাঁদের সকলের অবদানকে তিনি কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, টেকসইভাবে দারিদ্র্য নিরসন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পিকেএসএফ-এর ভূমিকা আজ দেশ ও বিদেশে স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

মুক্তিযোদ্ধাদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর পর্ষদ সভাপতির চেতনা ও দায়বদ্ধতাকে সমর্থন করে তিনি বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধে অবদানকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে ভবিষ্যতে পিকেএসএফ এ ধরনের সংবর্ধনা ও সম্মাননা প্রদান কর্মসূচি গ্রহণ করবে। এছাড়াও দেশব্যাপী মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়ন করে তাঁদের জন্যে কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে সহায়তা প্রদানে পিকেএসএফ-এর প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ওপর নির্মিত একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। প্রামাণ্য চিত্রটির মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি তুলে ধরা হয়। পটভূমিতে দেখা যায় ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই শুরু হয় পূর্ব বাংলার ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণমূলক আচরণ। কেবল অর্থনৈতিক শোষণ নয়, বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ওপরও নিপীড়ন শুরু হয়। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে প্রথম আঘাত আসে পূর্ব বাংলাবাসীর ভাষার অধিকারের ওপর। পাকিস্তানের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যখন ঢাকায় এসে একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন তখনই পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-জনতা এই ঘোষণার প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। এক সময় এই আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে। বাঙালি জাতি ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাজপথে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দেয়। ৫২-এর ভাষা আন্দোলন ছিল পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির প্রথম প্রতিরোধ। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী শেষ পর্যন্ত ১৯৫৬ সালে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

এরপর ১৯৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ৫৮-এর সামরিক শাসন জারি, ৬৬-এর ছয় দফা কর্মসূচি, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের স্বাধীনতার আন্দোলনকে উজ্জীবিত করে। ৭০-এর নির্বাচনে বিজয়ী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট উত্তপ্ত হয়ে উঠে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনুধাবন করতে পারেন যে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী কখনোই বাঙালিদের ন্যায্য অধিকার মেনে নেবে না। তাই ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে উত্তাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু তার ঐতিহাসিক ভাষণে স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাক দেন। ৭ মার্চের জনসভায় বাংলার জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও বঙ্গবন্ধুর প্রতি আপামর জনসাধারণের সমর্থনে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী শুরু করে অপারেশন সার্চলাইট নামে গণহত্যা। তারা মেতে ওঠে বর্বর হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসলীলায়। পাক বাহিনীর নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসলীলার প্রতিরোধে, বঙ্গবন্ধুর অনুপ্রেরণায় পূর্ব বাংলার আপামর জনসাধারণ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। লক্ষ লক্ষ তরুণ স্বাধীন দেশের আকাঙ্ক্ষায় এবং মা-বোনের সম্ভ্রম লুণ্ঠনের প্রতিহিংসায় মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। সশস্ত্র এই যুদ্ধে আত্মত্যাগ করেছেন ৩০ লক্ষ মানুষ। দীর্ঘ নয় মাস পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর সাথে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের

আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনেন। আমাদের সৌভাগ্য যে, মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগ ও দুর্নিবার সাহসিকতা প্রদর্শনকারী অনেক ত্যাগী বীর মুক্তিযোদ্ধা আজও আমাদের মাঝে বেঁচে রয়েছেন। এ সকল সাহসী মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে পিকেএসএফ-এর বেশ কিছু সহযোগী সংস্থার সভাপতি ও নির্বাহী পরিচালক রয়েছেন, যাঁরা দেশের স্বাধীনতা অর্জনে অসামান্য অবদান রেখেছেন। তাঁরা জীবনের মায়া তুচ্ছ করে দুর্বার সাহসিকতার সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর ১৮টি সহযোগী সংস্থার মোট ১২ জন সভাপতি এবং ১০ জন নির্বাহী পরিচালককে মুক্তিযুদ্ধের অসামান্য অবদান রাখার জন্যে একটি বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। সম্মাননাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সম্মাননা স্মারক, সনদ ও নগদ অর্থ প্রদান করা হয়।

বিশেষ অতিথি
মেজর জেনারেল হেলাল মুর্শেদ খান, বীরবিক্রম
সভাপতি, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ

অনুষ্ঠানের সভাপতি, প্রধান অতিথি ও সম্মাননাপ্রাপ্ত সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি রক্তিম শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেন, বর্তমানে সময় এসেছে পরবর্তী প্রজন্মের নিকট মহান মুক্তিযুদ্ধের তথ্য ও মুক্তিযোদ্ধাদের কাহিনী পৌঁছে দেওয়ার। যে সকল মুক্তিযোদ্ধা এখনও মুক্তিযুদ্ধের সার্টিফিকেট গ্রহণ

করেননি তাঁদেরকে মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট গ্রহণের জন্যে তিনি বিশেষভাবে আহ্বান জানান।

পিকেএসএফ-এর পর্ষদ সভাপতির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদানের এহেন মহতী উদ্যোগকে তিনি বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ-এর পক্ষ হতে অভিনন্দন জানান। এছাড়াও, এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্যদের তিনি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ২০১৪ সালে সৃষ্ট দেশীয় রাজনৈতিক অরাজকতার সময় ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর নেতৃত্বে গঠিত সম্মিলিত নাগরিক সমাজ-এর আন্দোলনের ধারায় বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এক হয়ে পাশাপাশি কাজ করায় তিনি গৌরবান্বিত বোধ করছেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। এছাড়াও দেশের প্রায় ১.২০ কোটি মানুষকে একত্রিত করে তাঁদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর সুবিশাল উদ্যোগকে তিনি স্বাগত জানান।

তিনি বলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে অনেকে বর্তমানে পঙ্গু, অসুস্থ, গরীব ও অসহায় হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। এই সকল মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান বর্তমান সরকার, বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশেষভাবে মূল্যায়ন করছেন। ২০০৯ সালে মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা ছিল মাসিক তিন হাজার টাকা যা বর্তমান সরকার দশ হাজার টাকায় উন্নীত করেছে। এছাড়াও মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধারা তাঁদের সম্মান জাতীয়ভাবে প্রাপ্যতার অধিকার রাখে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান জানানোর মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধ

জানতে পারবে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সহমর্মী হয়ে তাঁদের পক্ষে প্রকৃত অনুভূতি জানানোর সুযোগ সৃষ্টি হবে যা তাঁদেরকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখতে সহায়তা করবে। তিনি বলেন, মুক্তিযোদ্ধারা গরিব ও অসহায়, এ হিসেবে চিহ্নিত করা নয় বরং তাঁদের সম্মান রক্ষা ও মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার আরো গভীরভাবে ভাবছে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, বর্তমানে দেশের বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ ও সম্মান জানানো হচ্ছে। এছাড়াও ১ ডিসেম্বরকে মুক্তিযোদ্ধা দিবস হিসেবে ঘোষণাপূর্বক তা জাতীয়ভাবে পালনের লক্ষ্যে এতদ্বিষয়ক অনুমোদনের বিষয়টি সরকারি পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণে উদ্দীপ্ত হয়ে দুর্নিবার মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পাক-হানাদার বাহিনীকে পরাজিত ও দেশকে স্বাধীন করে শোষণমুক্ত, ধর্মনিরপেক্ষ, বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ধারা ও জঙ্গীবাদীরা মুক্তিযোদ্ধাদের সেই স্বপ্নকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করার উদ্যোগ নিয়েছে। তাই পুরনো ধারণায় ফিরে না গিয়ে বরং ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে সম্মানজনক অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে তিনি পিকেএসএফ-এর সকল সহযোগী সংস্থাকে প্রধানমন্ত্রীর ঐক্যের আহ্বানে সমবেত হয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে তৃণমুল পর্যায়ে পৌঁছে দিতে অনুরোধ করেন। পরিশেষে, তিনি মুক্তিযুদ্ধবিরোধী সকল অপশক্তি নির্মূলের লক্ষ্যে মহান মুক্তিযুদ্ধের ধারায় দেশ পরিচালনা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সকল শক্তিকে একত্রিত হয়ে সম্মিলিতভাবে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সভাপতির বক্তব্য
ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
সভাপতি, পিকেএসএফ

সভাপতি মহোদয় তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই অনুষ্ঠানে মাননীয় ডেপুটি স্পীকারের উপস্থিতি এবং তাঁর সম্পৃক্ততার জন্যে তাঁকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান। তিনি পিকেএসএফ-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জনাব এম. সাইদুজ্জামান-এর প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং সম্মাননাপ্রাপ্ত সকল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি বিশেষভাবে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ মানেই বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধুর নামের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তিনি বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণকে উদ্ধৃত করে বলেন, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। এ আহ্বানের মধ্যে পিকেএসএফ-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত রয়েছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। কারণ পিকেএসএফ-এর লক্ষ্য হচ্ছে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন। তিনি আরো বলেন, মুক্তিযুদ্ধ মানে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের যারা আসবে বঞ্চনা হতে তাঁদের সকলের মুক্তি। মুক্তিযুদ্ধ না হলে শোষণমুক্ত সমাজ ও স্বাধীনতা আসতো না। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে দেশের অনেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। সময় এসেছে যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন এবং এখনো বেঁচে আছেন তাঁদেরকে বিশেষভাবে সম্মাননা জানানোর। পিকেএসএফ-এর উদ্যোগে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা দিতে পারায় গৌরবান্বিত বোধ করছেন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সভাপতি মহোদয় বলেন, দাতা-গ্রহীতার ধারণা ত্যাগ করে সবাইকে একত্রিত করে মানুষের জন্যে কাজ করার অঙ্গীকার নিয়ে পিকেএসএফ তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। এই কাজকে ধারাবাহিক

এবং সুসংহত করার জন্য পিকেএসএফ সমৃদ্ধিভুক্ত ১৫০টি ইউনিয়নে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধাদের চিহ্নিত করে তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সভাপতি মহোদয় বলেন, দেশের অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধাদের শারীরিক ও সামাজিক অবস্থা নাজুক। স্বাস্থ্য খারাপ থাকার কারণে তাঁদেরকে চিকিৎসা খাতে মাসে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়। তিনি আরো বলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে অনেকে সম্মাননা পেয়ে থাকেন, কিন্তু যারা সম্মাননা পান না তাঁদেরকে ও কোনভাবেই অবহেলা করা যাবে না। তাই তাঁদের প্রাপ্য ও প্রকৃত সম্মান দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযথ মূল্যায়ন ও সম্মান না দেওয়া হলে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে অস্বীকার করা হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়নি বরং কালপরিক্রমায় তারা ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চার করছে এবং মাঝে মাঝে তাঁদের শক্তিকে দৃশ্যমান করে তুলেছে। মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখতে হলে সকল পর্যায়ের মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

এই লক্ষ্যে সম্মিলিত নাগরিক সমাজ গঠন করে এতদ্বিষয়ক আন্দোলন দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও তরুণদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনাকে ছড়িয়ে দেওয়ারও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগে ভবিষ্যতে পিকেএসএফ সম্পৃক্ত হবে বলে তিনি সকলকে অবহিত করেন। স্কুল-কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের গল্প না বলে এবং না পড়িয়ে বরং সামনাসামনি মুক্তিযোদ্ধাদের মাধ্যমে সেই কাহিনী তুলে ধরে বিশ্বাস স্থাপনের সুযোগ সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে এতদ্বিষয়ক পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা পরবর্তীকালে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভিত্তিক অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সংস্কৃতি লালন ও তা বিস্তারের উদ্যোগ নেয়ার ব্যাপারেও তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

সমন্বিত উদ্যোগের আলোকে দেশের ১৫০টি ইউনিয়নে মানুষের সক্ষমতা ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মানুষকে সম্পৃক্ত করে এবং সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে মানুষের সর্বোত্তম উন্নয়ন ও সেবা নিশ্চিতকরণে পিকেএসএফ কাজ করছে বলে তিনি দৃঢ়ভাবে মন্তব্য করেন। **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি সামগ্রিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে বলে সাম্প্রতিক বহিঃমূল্যায়নে ও তা উঠে এসেছে বলে তিনি সকলকে অবহিত করেন। বিগত চার মাসে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করার অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি বলেন, মানুষের সাথে আলাপ করলে তাঁদের সমস্যা ও অবস্থা জানা এবং বুঝা যায়। এমন অভিজ্ঞতা উন্নয়ন ভাবনার কৌশল প্রণয়নে সহায়কের ভূমিকা পালন করে। তিনি মানুষকে

সম্পৃক্ত করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সুযোগ সৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ওপর বিশেষভাবে নজর দেয়া হচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, সমাজে ন্যায্য অধিকার পাওয়াটা এখন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের সকল স্তরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে সরকার এবং এর বাইরে থাকা সকল প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি ও সংগঠককে দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসার জন্যে তিনি সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

প্রধান অতিথি
জনাব মোঃ ফজলে রাব্বি মিয়া
ডেপুটি স্পীকার, জাতীয় সংসদ

পিকেএসএফ-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বর্তমান সভাপতি, সহযোগী সংস্থার প্রধান নির্বাহী ও সভাপতি, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ-এর সভাপতি ও সম্মাননা প্রাপ্ত সকল মুক্তিযোদ্ধাকে তিনি অভিবাদন জানান। বক্তব্যের শুরুতেই তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদানের লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর গৃহীত এ মহতী উদ্যোগটি খুবই প্রশংসনীয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান দেয়ার অর্থ হচ্ছে বঙ্গবন্ধুকে সম্মান দেয়া, বাংলাদেশকে সম্মান দেয়া। তিনি বলেন, বাংলাদেশে অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান জানানোর মানসিকতা বা বোধ নেই। সেই বিবেচনায় মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান করায় পিকেএসএফ সকলের নিকট আরো সম্মানিত হয়েছে বলে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন।

তিনি বলেন, পিকেএসএফ দেশ ও জাতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে টেকসইভাবে দারিদ্র্য নিরসনে নিষ্ঠা, সততা এবং দক্ষতার সাথে নিরলসভাবে কাজ করছে,

যা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বপ্নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি বলেন, পিকেএসএফ কর্তৃক মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান প্রদানের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে, যা এই সংস্থার ভাবমূর্তিকে উজ্জলতর করে তুলবে।

পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় স্পীকারের নিজ নির্বাচনী এলাকার দু'টি ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সমন্বিত কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে ইউনিয়ন দু'টিতে অসচ্ছলতা নেই, ভিক্ষুকরা পুনর্বাসিত হয়ে সংসার চালাচ্ছে যা স্থানীয় পর্যায়ে অকল্পনীয় সাফল্যের উদাহরণ সৃষ্টি করেছে বলে তিনি সকলকে অবহিত করেন। গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা রাখতে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বর্তমান ধারা ভবিষ্যতে অব্যাহত রাখতে হলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে উচ্চে তুরে ধরতে হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

তিনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে হয়তোবা বাংলাদেশেরই জন্ম হতো না। বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে স্বাধীনতা, একটি স্বাধীন ভূখণ্ড ও একটি পতাকা দিয়েছেন। সুতরাং বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ও অবদান বাঙালি জাতির নিকট চিরস্মরণীয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা দেশে এক গভীর রাজনৈতিক শূন্যতা ও সংকট সৃষ্টি করে। দুঃখজনক যে, স্বাধীনতার চার বছরের মধ্যে অনেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচয় দিতে অনেকেই শঙ্কা ও কুণ্ঠাবোধ করতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্যে তাঁকে তিন মাস পালিয়ে থেকে অবরুদ্ধ জীবনযাপন করতে হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় বর্তমান সরকারের নীতি ও নানাবিধ উদ্যোগ অত্যন্ত সময়োচিত পদক্ষেপ বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

ইতিহাসের কালক্রমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বর্জিত হওয়ায় নিকট অতীতে বাঙালি জাতিকে অনেক খেসারত দিতে হয়েছে। তাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে বীরের জাতি হিসেবে বেঁচে থাকার লক্ষ্যে তিনি সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি যাতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সেজন্যে তিনি সকলকে সচেতন হওয়া এবং সতর্ক দৃষ্টি রাখার অনুরোধ করেন। তিনি সাম্প্রতিক জঙ্গিবাদের উত্থান প্রতিরোধে সামাজিক রেঁনেসার প্রয়োজন রয়েছে বলে মন্তব্য করেন। তিনি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, বাঙালি বীরের জাতি, তাঁরা সব করতে পারে। তিনি সকলকে যার যার অবস্থান হতে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে আহ্বান জানান, যাতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকে।

হীড বাংলাদেশ-এর সাংস্কৃতিক দলের উপস্থাপনা

অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হীড বাংলাদেশ-এর সাংস্কৃতিক দল মনোমুগ্ধকর পটগানের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভিত্তিক কোরিওগ্রাফি **আমার দেশ আমার পতাকা** এবং **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ফুটিয়ে তোলে। তারা পটগানের মাধ্যমে মূলত দারিদ্র্য নিরসন, সামাজিক ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণাগুলো তুলে ধরে। পাশাপাশি জনগণের মূল্যবোধ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নয়নে গ্রামীণ পরিবারের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচির বিভিন্ন পদক্ষেপও তুলে ধরা হয়। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে বাল্যবিবাহ, শিশু নির্যাতন, ইভ টিজিং, ইউনিয়ন উন্নয়ন কেন্দ্র, পরিবারকেন্দ্রিক পরিকল্পনা, পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, যুব মেলা, সৌর বিদ্যুৎ, যুব প্রশিক্ষণ, বায়োগ্যাস, বন্ধুচুলা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, পতিতজমিতে সবজি ও বাসক পাতা চাষ, জৈব ও কেঁচো সার, ভিক্ষুক পুনর্বাসন, আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, সমৃদ্ধি কেন্দ্র, সমৃদ্ধি বাড়ি ইত্যাদি পটগানের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়।

সম্মাননাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের সারসংক্ষেপ

সম্মাননাপ্রাপ্ত প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধাকে স্মারক ও সনদ গ্রহণ করার জন্য মঞ্চে আহ্বান জানানো হয়। তাঁরা প্রত্যেকে এই সম্মাননা গ্রহণ করবার পূর্বে মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ভাষ্য পাঠ করা হয়। তাঁদের অবদান বিষয়ে পঠিত সারসংক্ষেপ এখানে পত্রস্থ করা হলো।

ক্র. নং	নাম ও পরিচয়	মুক্তিযুদ্ধকালীন সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১	ড. মোঃ আহ্সান আলী সভাপতি **আশ্রয়**	বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. মোঃ আহ্সান আলী বি.এল.এফ-এর চাঁপাইনবাবগঞ্জ সাব-সেক্টরের অধীনে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। একাত্তরের রণাঙ্গনে তিনি সেক্টর কমান্ডার জনাব মুনিরুল ইসলাম-এর নেতৃত্বে পাক-সেনাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। পিকেএসএফ তাঁর এই বীরত্বপূর্ণ অবদান গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছে। তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন।
২	জনাব মোঃ আজিজুল হক সভাপতি **সূচনা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (এসএসইউএস)**	বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ আজিজুল হক ৬নং সেক্টরের আওতাধীন ৬/ক সাব-সেক্টর এর কমান্ডার জনাব এম.কে.বাসার-এর নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। মুক্তিযোদ্ধা জনাব আজিজুল হক-কে পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন।
৩	জনাব এ এস এম নূরুল আলম নির্বাহী পরিচালক **এসোসিয়েশন ফর রুরাল এডভান্সমেন্ট ইন বাংলাদেশ (আরব)**	বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব এ এস এম নূরুল আলম ২নং সেক্টরের আওতাধীন ঢাকার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সেক্টর কমান্ডার মেজর হায়দার-এর নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে দেশমাতৃকার সেবায় বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তাঁকে আমাদের প্রাণঢালা অভিনন্দন।
৪	ডাঃ এ এফ এম সাখাওয়াৎ হোসেন সভাপতি **এসোসিয়েশন ফর রিনোভেশন অফ কমিউনিটি হেলথ এ্যাডুকেশন সার্ভিসেস (আরচেস)**	বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ এ এফ এম সাখাওয়াৎ হোসেন ৮নং সেক্টরের আওতাধীন চুয়াডাঙ্গা জেলাধীন সাব-সেক্টরে সেক্টর কমান্ডার মেজর আবু ওসমান চৌধুরী এবং মেজর মঞ্জুর-এর নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর এই বীরত্বপূর্ণ অবদান পিকেএসএফ গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছে।
৫	জনাব এ বি এম সিদ্দীক সভাপতি **পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র**	বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব এ বি এম সিদ্দীক সেক্টর কমান্ডার মেজর (অবঃ) এম. এ. জলিল এর নেতৃত্বাধীন ৯নং সেক্টরের অধীনে মুক্তিযুদ্ধের সম্মুখ সমরে অংশগ্রহণ করে বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। জনাব সিদ্দীক-কে পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে অভিনন্দন।

ক্র. নং	নাম ও পরিচয়	মুক্তিযুদ্ধকালীন সংক্ষিপ্ত বিবরণ
৬	জনাব এস.এম. হারুন অর রশীদ লাল নির্বাহী পরিচালক **সলিডারিটি**	বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব এস. এম. হারুন অর রশীদ লাল ৬নং সেক্টরের আওতাধীন ৫নং সাব-সেক্টর এর কমান্ডার জনাব খাদেমুল বাশার-এর নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধে দেশমাতৃকার সেবায় জীবন বাজী রেখে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হন। তাঁর এই বীরত্বপূর্ণ অবদান সমগ্র জাতির সাথে আমরাও গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। তাঁকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন।
৭	জনাব এম. এ. সামাদ নির্বাহী পরিচালক **সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স (সিসিডিএ)**	বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব এম.এ. সামাদ ২নং সেক্টর এর কমান্ডার মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ-এর নেতৃত্বে স্বাধীনতা যুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদান আমাদের চিরঋণী করেছে। আমরা জনাব সামাদ-এর অসামান্য অবদানের জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।
৮	জনাব মোহাম্মদ এনামুল হক সভাপতি **দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা (ডিইউএস)**	বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোহাম্মদ এনামুল হক ২নং সেক্টরের কমান্ডার মেজর এ টি এম হায়দার-এর নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধে আমরা জনাব এনামুল হক-এর অসামান্য অবদানের জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তাঁকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন।
৯	অধ্যাপক কাজী আবুল বাসার সভাপতি **কোতয়ালী থানা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ এসোসিয়েশন লিঃ (কেটিসিসিএ)**	বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব কাজী আবুল বাসার মুজিব বাহিনীর আওতায় সেক্টর কমান্ডার জনাব মোঃ নাজমুল হাসান পাখি-এর নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তাঁকে পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন।
১০	জনাব কিউ.এ.এস.এম. ইয়াকুব সভাপতি **হ্যাবিট্যাট এন্ড ইকোনমি লিফটিং প্রোগ্রাম (হেল্‌প)**	জনাব কিউ.এ.এস.এম. ইয়াকুব একই সাথে একজন বীর নৌ-কমাণ্ডো মুক্তিযোদ্ধা। তিনি ভারতের বিহারে অবস্থিত চাকুলিয়া ক্যান্টনমেন্ট হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, তিনি ৯নং সেক্টরের অধীনে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও যুদ্ধকালীন সময়ে তিনি ভারতীয় নৌ-বাহিনীর কমান্ডার জেমস মার্টিজের অধীনে নৌ-কমাণ্ডো হিসেবে মহান মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তাঁকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন।

ক্র. নং	নাম ও পরিচয়	মুক্তিযুদ্ধকালীন সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১১	জনাব নুরুল হক সরকার নির্বাহী পরিচালক **নজীর (নতুন জীবন রচি)**	বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব নুরুল হক সরকার ৬নং সেক্টরের আওতায় সেক্টর কমান্ডার জনাব খাদেমুল বাশার-এর নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে তাঁকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন।
১২	জনাব নাজিবুর রহমান সভাপতি **নিউ এরা ফাউন্ডেশন (এনইএফ)**	বীর মুক্তিযোদ্ধা নাজিবুর রহমান ৮নং সেক্টর এ সেক্টর কমান্ডার মেজর মুস্তাফিজুর রহমান-এর নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। আমরা তাঁর অবদান গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। পিকেএসএফ পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন।
১৩	জনাব ফকীর আব্দুল জব্বার নির্বাহী পরিচালক **কর্মজীবী কল্যাণ সংস্থা (কেকেএস)**	বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব ফকীর আব্দুল জব্বার ৮নং সেক্টরে সেক্টর কমান্ডার মেজর মঞ্জুর আহমেদ-এর নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র অংশগ্রহণ করেন। উল্লেক্ষখ্য যে, ১৯৭১ সালে ২১ এপ্রিল রোজ বুধবার জনাব ফকীর আব্দুল জব্বার গোয়ালন্দ ঘাটে পাক বাহিনীর সাথে মুখোমুখি যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে আমরা তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।
১৪	জনাব মহসিন আলী নির্বাহী পরিচালক **ওয়েভ ফাউন্ডেশন**	বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মহসিন আলী ৮নং সেক্টরের আওতাধীন বানপুর সাব-সেক্টর এ সেক্টর কমান্ডার মেজর এম. এ. মঞ্জুরের নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর এ অসামান্য অবদানের জন্য পিকেএসএফ পরিবারের পক্ষ থেকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন।
১৫	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সভাপতি **দিশা স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণ সংস্থা**	বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান ৮নং সেক্টরের আওতাধীন কুষ্টিয়া সাব-সেক্টরে কমান্ডার লেঃ খন্দকার নূরুন্নবী এর নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, একাত্তরের রণাঙ্গনে ৮নং সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন যথাক্রমে মেজর আবু ওসমান চৌধুরী এবং মোঃ আবুল মঞ্জুর। তাঁকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন।

ক্র. নং	নাম ও পরিচয়	মুক্তিযুদ্ধকালীন সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১৬	জনাব মঞ্জুর রহমান বিশ্বাস নির্বাহী পরিচালক **নিউ এরা ফাউন্ডেশন (এনইএফ)**	বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মঞ্জুর রহমান বিশ্বাস ৭নং সেক্টরের আওতাধীন ২নং সাব-সেক্টর কমান্ডার মেজর মরহুম নূরুজ্জামান (বীর বিক্রম)-এর নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। জনাব বিশ্বাসকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন।
১৭	মিজ মাজেদা শওকত আলী প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা **নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা)**	মিজ মাজেদা শওকত আলী ২নং সেক্টরের আওতাধীন ২নং (মাদারীপুর) সাব-সেক্টর কমান্ডার ব্রিগেঃ জেনারেল খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রাখেন। যুদ্ধকালীন সময়ে তাঁর সাহসিকতা জাতিকে ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে এবং এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাঁর অবদান আমাদের চিরঋণে আবদ্ধ করেছে। তাঁকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন।
১৮	ড. মকবুল আহ্‌মেদ খান চেয়ারম্যান **বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ)**	বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. মকবুল আহ্‌মেদ খান ১১নং সেক্টরের আওতাধীন গোপালগঞ্জ থানায় যুদ্ধরত মুজিব বাহিনীতে অংশগ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে শত্রুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য তাঁর এই অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন।
১৯	জনাব মীর আল আমীন সাধারণ সম্পাদক **হ্যাবিট্যাট এন্ড ইকোনমি লিফটিং প্রোগ্রাম (হেল্‌প)**	জনাব মীর আল আমীন একজন বীর নৌ-কমাণ্ডো ও মুক্তিযোদ্ধা। তিনি ভারতের বিহারে অবস্থিত চাকুলিয়া ক্যান্টনমেন্ট হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি ৯নং সেক্টরের কমান্ডার মেজর (অবঃ) এম.এ. জলিলের অধীনে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধকালীন সময়ে তিনি ভারতীয় নৌ-বাহিনীর কমান্ডার জেমস মার্টিজের অধীনে নৌ-কমাণ্ডো হিসেবেও বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তাঁকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন।
২০	জনাব মোঃ রফিকুল আলম নির্বাহী পরিচালক **দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা (ডিইউএস)**	বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ রফিকুল আলম ২নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার মেজর এটিএম হায়দারের নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর এই বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্যে তাঁকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন।

ক্র. নং	নাম ও পরিচয়	মুক্তিযুদ্ধকালীন সংক্ষিপ্ত বিবরণ
২১.	জনাব মোঃ সামছুল হক সভাপতি **আমরা কাজ করি (একেকে)**	বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ সামছুল হক ৮নং সেক্টরের আওতাধীন ৩৪১৮নং সাব-সেক্টর এর অধীনে মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। জনাব সামছুল হক-কে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন।
২২	জনাব মুহম্মদ হিলালউদ্দিন সভাপতি **সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স (সিসিডিএ)**	বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মুহম্মদ হিলালউদ্দিন ২নং সেক্টরের কমান্ডার স্থপতি ওয়াফেস ওসমান-এর নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধে এই অসামান্য ও বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি আমরা গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তাঁকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন।

উন্নয়নে পিকেএসএফ ও মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা

পিকেএসএফ মিলনায়তন

২৭ জুলাই ২০১৬

সম্মাননাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যক্তিগত ভাষ্য

মাজেদা শওকত আলী (নুসা)

আমার জীবন আমার যুদ্ধ

শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলাধীন বাঁশতলা গ্রামে ১৯৪৭ সালের ৯ জুলাই আমার জন্ম। আমার মায়ের নাম সালমা ওয়াহেদ, বাবা আবদুল ওয়াহেদ বেপারী। বংশ পরম্পরায় আমরা সম্ভ্রান্ত ও সচ্ছল। তিন ভাই ও পাঁচ বোনের মধ্যে আমি তৃতীয়।

আমার শিক্ষাজীবন শুরু হয় শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া থানাধীন মুলফৎগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। আমিই ছিলাম এ বিদ্যালয়ের প্রথম নারী শিক্ষার্থী। আমি ধানমন্ডি বয়েজ হাইস্কুল থেকে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে কৃতিত্বের সাথে মাধ্যমিক পাশ করি। তেজগাঁও মহিলা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক পাশ করি বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ হতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে লাভ করি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

আমার সন্তানের ছয় মাস বয়সকালে আমার স্বামী শওকত আলী ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তখন থেকে শুরু হয় আমার অস্থির ও অনিশ্চিত পারিবারিক জীবন। যুদ্ধ শেষে স্বামী কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে বদলি হন। এখানে এসে তিনি পূর্ব পাকিস্তানকে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন করার বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে পড়েন।

১৯৬৮ সালের ১০ জানুয়ারি দেশদ্রোহী ষড়যন্ত্রে (!) জড়িত থাকার অভিযোগে তিনি গ্রেফতার হন। তাঁদের বিরুদ্ধে 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য' নামে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা হয়। সাধারণভাবে এ মামলা 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে খ্যাত। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ মামলার ১নং অভিযুক্ত ছিলেন, আমার স্বামী শওকত আলী ছিলেন ২৬নং অভিযুক্ত (ব্যক্তি)।

বঙ্গবন্ধুকে মামলায় জড়িত করার কারণে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবল গণআন্দোলন শুরু হয়। ১৯৬৯ সালে সংঘটিত হয় গণ অভ্যুত্থান। সেই অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী মহিলা কর্মীদের মধ্যে আমি ছিলাম সার্বক্ষণিক এবং অন্যতম উদ্যোগী কর্মী।

আগরতলা মামলা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর আমার স্বামীকে সেনাবাহিনী থেকে অকাল অবসর দেয়া হয়। তিনি যশোর জেলার নওয়াপাড়ার নিকটবর্তী রাজঘাটস্থ কার্পেটিং জুট মিলে প্রশাসনিক কর্মকর্তার চাকরি নেন। ইতোমধ্যে বাঙালির অনন্ত গৌরবের মূল অনুষঙ্গ মহান মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। দেশের মুক্তি কামনায় আত্মোৎসর্গিত সেনা শওকত আলী যুদ্ধে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর খোঁজে পাকবাহিনী ২৭ মার্চ জুটমিল আক্রমণ করে। আমার সন্তানদের মাথায় অস্ত্র ঠেকিয়ে তথ্য আদায়ের চেষ্টা করে। কিন্তু আমি দৃঢ়ভাবে পরিস্থিতি সামলে নেই। পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে আমি সিদ্ধান্ত নিই,

সন্তানদের এবং নিজেকে বাঁচানোর জন্য আমাকে পালাতে হবে। শওকত আলী আমাদের জন্য নৌকার ব্যবস্থা করেন এবং আমাদেরকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন। শেষে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমরা অতি সংগোপনে জুট মিল থেকে পালাতে সক্ষম হই। আমরা চলে আসি নড়িয়ায় আমাদের নিজ গ্রামে। এখান থেকে শওকত আলী যুদ্ধে চলে যান। তিনি মাদারীপুর এলাকার কমান্ডার এবং পরে ২নং সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডার ও প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা নিযুক্ত হন। স্বামী মুক্তিযুদ্ধে চলে যাওয়ার পর সন্তানদের নিয়ে আমি আত্মগোপন করি।

দুই মাস আত্মগোপনে থাকার পর ১৯৭১ সালের জুন মাসে আমি সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য আগরতলা গমন করি। এখানে আমি আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করি। শরণার্থী শিবিরের অসহায় মানুষদের পাশে প্রবল সাহস নিয়ে দাঁড়িয়ে যাই। তারপর আসে স্বপ্ন ও বিশ্বাসের চির কাঙ্ক্ষিত বিজয়। আমরা দেশে ফিরে আসি। গ্রামে আমাদের ঘরবাড়ি, স্থাপনা, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান পাকিস্তান আর্মি ও তাদের দোসরদের দেয়া আগুনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

সংসারে সন্তানদের আর রাজনীতিতে স্বামীর সাফল্য আমাকে ভোগী, বিলাসী বা ক্ষমতাদম্ভী মানুষে পরিণত করতে পারেনি। আমি বরং আমার দক্ষতা ও যোগ্যতা দিয়ে গণমানুষের বিশেষ করে অবহেলিত ও বঞ্চিত নারীদের মুক্তির অনুকূলে ব্যবহারে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়েছি। **নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি** বা **নুসার** প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি ১৯৯৯ সাল হতে। বাংলা একাডেমি, জাতিসংঘ সমিতি, কেন্দ্রীয় জাতীয় আইনগত সহায়তা কমিটি, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ), এডাব, নড়িয়া গণপাঠাগার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসেবে ভূমিকা রাখার চেষ্টা করে চলেছি। চেয়ারম্যান হিসেবে পরিচালনা করছি মাজেদা হাসপাতাল ও নড়িয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। সভাপতি হিসেবে গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র, নড়িয়া পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, লোনসিং গিয়াস উদ্দিন বালিকা বিদ্যালয় ও চন্ডিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম এগিয়ে নিতে সচেষ্ট রয়েছি। অনগ্রসর নারীদের জন্য চালু করেছি নুসা বিশেষ শিক্ষালয়, আমিই এর প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান।

এ ছাড়াও সভাপতি, সহ-সভাপতি বা মহিলা উপদেষ্টা হিসেবে জড়িত রয়েছি সিডিএফ, বাংলাদেশ মহিলা সমিতি, সুইট বাংলাদেশ, শরীয়তপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, আমার অধিকার প্রভৃতি সংস্থার সাথে। মুক্তিযুদ্ধের অবিনাশী চেতনা ছড়িয়ে দিতে সম্পাদনা করে চলেছি মাসিক *মুক্তি* নামের সর্বজন সমাদৃত সাময়িকী।

আমার এইসব কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রাজ্ঞজন ও সমালোচকের প্রশংসা কুড়িয়েছে। ২০১০ ও ২০১৫ সালে পেয়েছি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সংবর্ধনা ও সম্মাননা, পেয়েছি শ্রেষ্ঠ জয়িতা স্বীকৃতি, মানবাধিকার সম্মাননা সনদ ২০০৮, পিকেএসএফ সম্মাননা, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ পদক, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা স্বর্ণপদক, শহীদ আইভি রহমান পদক, মাদার তেরেসা পদক ও রত্নগর্ভা মা সম্মাননা।

মহসিন আলী (ওয়েভ ফাউন্ডেশন)

মুক্তিযুদ্ধ আমার অহংকার

আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াকালীন অভিভাবক, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশি কিংবা বাবার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দেখা হলে প্রায়শই শুনতাম ভাল করে পড়াশোনা কর, তাহলে অনেক বড় হতে পারবে। চুয়াডাঙ্গা জেলাধীন সীমান্ত শহর দর্শনায় বসবাসরত অবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার গণ্ডি পেরিয়ে

১৯৬৬ সালে মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য বেশ উত্তেজনা ও কিছুটা ভয় নিয়ে স্থানীয় মাথাভাঙ্গা নদীর তীরে প্রতিষ্ঠিত মেমনগর বি ডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হই। তখন ছাত্র ইউনিয়ন ও ন্যাপ-এর কর্মীরা শিক্ষা নীতি প্রণয়ন ও ছাত্রদের সমস্যার কথা বেশি করে তুলে ধরতেন। পাশাপাশি সমাজতন্ত্রের পক্ষে এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও কথা বলতেন। অপরদিকে, ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের কর্মীরা ছাত্রদের সমস্যার পাশাপাশি পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনসহ ৬ দফা দাবির কথা বলতেন। স্থানীয়ভাবে ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীদের বক্তব্য ও আচরণ আমাকে বেশি প্রভাবিত করেছিল। সময়ের পরিক্রমায় রাজনীতিতে ২টি শ্লোগান যথাক্রমে 'জয় বাংলা' ও 'জয় সমাজতন্ত্র' ক্রমান্বয়ে দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

১৯৭০ এর জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ জয়ের পরেও পশ্চিমা শাসকরা ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা করে ১ মার্চ ১৯৭১ সালে পার্লামেন্টের অধিবেশন বাতিল করার পরিপ্রেক্ষিতে সারা বাংলার মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে যেভাবে গর্জে উঠেছিল তা বাঙালি জাতির জীবনে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। এ প্রেক্ষাপটে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ভাষণ, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' সমগ্র জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছিল। এরপর শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। ২৫ মার্চ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হামলা।

২৭ মার্চ ১৯৭১ চুয়াডাঙ্গায় বিমান হামলা এবং স্থলপথে পাকিস্তানী বাহিনীর দর্শনায় আগমনের খবরের প্রেক্ষিতে স্থানীয় মানুষদের অনেকের মতই আমাদের পরিবারও ভারতীয় সীমান্তের দিকে মদনা নামক গ্রামে অবস্থান নেয়। শুরু হল মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য কিছু রাজনৈতিক কর্মী ও সাধারণ ছাত্র-যুবদের ভারতে প্রশিক্ষণ নেয়ার পালা। অন্য অনেকের মতো আমিও মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য মানসিক ও শারীরিকভাবে প্রস্তুতি নিতে থাকি। আমাদের সীমান্তের অপরদিকে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত ও প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে যেমন ক্যাম্প ছিল, পাশাপাশি ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্র ইউনিয়নের

গেরিলা বাহিনীতেও সংগঠিত করার পৃথক একটি ক্যাম্প ছিল। অপরদিকে আওয়ামী লীগের মুজিব বাহিনীতে পৃথকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সংযুক্ত করার একটি প্রক্রিয়াও ছিল। একজন ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী হিসেবে যোগাযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্র ইউনিয়নের গেরিলা বাহিনীতে সংযুক্ত হই। পরবর্তী কালে ভারতের আসাম রাজ্যের, তেজপুর জেলার স্যালনবাড়ি ক্যান্টনমেন্টে ৪০০ জন সহকর্মীর সাথে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করি। প্রশিক্ষণের কিছুদিন পর পূর্বাঞ্চলের সহযোদ্ধারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য দেশের ভিতরে ঢুকে পড়েন। একই দলের পশ্চিমাঞ্চলে আমরা সীমান্তে অবস্থান করে দেশের ভিতরে বিভিন্ন অপারেশনে অংশগ্রহণ করি। দীর্ঘ ৯ মাসের যুদ্ধের পর ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসের পূর্বে ৪ ডিসেম্বর দর্শনাসহ আশেপাশের এলাকা এবং ৭ ডিসেম্বর চুয়াডাঙ্গা হানাদার শত্রু মুক্ত হয়। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ঘটনা, আমার অনন্য অহংকার।

মুক্তিযুদ্ধের পরে দেশকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছি। দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করে মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। এলাকার দরিদ্র, হতদরিদ্র মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেবার প্রয়াস নিয়েছি। শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ তৈরি করার চেষ্টা করেছি। অবহেলিত নারীরা যাতে চার দেয়ালের বাইরে এসে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত হতে পারে তার জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি। এ রকমই একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান **ওয়েভ ফাউন্ডেশন**-এর নির্বাহী পরিচালক হিসেবে বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছি। যত দিন বেঁচে থাকবো সমাজ ও মানুষের জন্য কাজ করে যাবো এটাই আমৃত্যু প্রতিজ্ঞা।

মীর আল আমীন (হেল্প)

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের পটভূমি

মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে আমার পিতা মরহুম এ্যাডভোকেট মীর মোশাররফ আলীর প্রভাবই ছিল সর্বাধিক। আমার পিতা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে বেকার হোস্টেলে থাকাকালীন বঙ্গবন্ধুর সাহচর্যে আসেন। শৈশবেই আব্বার মুখে শেখ মুজিবুর রহমানের নাম শুনি। তার অসাধারণ গুণের কথা শুনতে শুনতে এক সময় তাকে আমাদের একজন আপনজন হিসেবে ভাবতে শুরু করি।

১৯৭০-এর নির্বাচনের পরে আমাদের চারপাশের সবকিছুই দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। গোটা পূর্ব পাকিস্তান তখন বঙ্গবন্ধুর পেছনে ঐক্যবদ্ধ। রমনা রেসকোর্সে ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু আমাদের প্রত্যাশিত ঘোষণাটি দিলেন 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম', যার জন্য গোটা জাতি ছিল অপেক্ষমাণ।

২৫ মার্চ গণহত্যা শুরু করার পর হানাদারেরা ধীরে ধীরে তাদের আক্রমণের পরিধি বিভাগীয় শহর থেকে মহকুমা শহরগুলির দিকে বিস্তৃত করলো। এরই ধারাবাহিকতায় তারা এপ্রিল মাসের ৪র্থ সপ্তাহে অতি প্রত্যুষে অতর্কিতভাবে বাগেরহাট আক্রমণ করলো। প্রথমে তারা দূর থেকে মর্টার সেলের বিকট আওয়াজে মানুষজনকে আতঙ্কিত করে ফেলল। তারপরে একাধিক প্রবেশ পথ ধরে হানাদারেরা নিরীহ, নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করতে করতে শহরে প্রবেশ করল। পাকিস্তানীদের মূল লক্ষ্য ছিল গণহত্যা। হাজার-হাজার নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, শিশু প্রাণ বাঁচাতে বাগেরহাটের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া দড়াটানা নদীর মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছিল। হত্যাযজ্ঞের পাশাপাশি তারা বাজারে আগুন ধরিয়ে দিল। বাজারের মধ্যে তেলপট্টি বলে একটি অঞ্চল ছিল। আগুনের তাপে সেখানে মজুদ করে রাখা তেলের ড্রামগুলি বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়ে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছিল। সেদিন আগুনের তাপে বন্দী হয়ে বহু মানুষ জীবন্ত দগ্ধ হয়, কোন মানুষ তাদের কাউকে সাহায্য করতে পারেনি।

পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে আমার আম্মা আমাকে বাড়ি থেকে সরিয়ে দেন। এরপর তিনি ভারতে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক এমন একটি দলের হাতে আমাকে তুলে দেন। ভারতে যাত্রাপথে প্রতিটি মুহূর্ত ছিল অকল্পনীয় বিপদসংকুল। যাত্রাপথের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মধ্যে সাতক্ষীরা চুকনগরের গণহত্যার অভিজ্ঞতা ভুলবার নয়। ভারতে নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় কয়েক শত নৌকার একটি কাফেলায় মেশিন গান দিয়ে ভয়াবহ গণহত্যা সংঘটিত হয়। গণহত্যার ২ দিন পরে আমরা চুকনগরের সেই নদী পথটি অতিক্রম করেছিলাম। নদীতে তখন বুলেটে ক্ষত-বিক্ষত শত শত ভাসমান নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধদের লাশ পচে-ফুলে স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছিল। আর সেই ভাসমান মৃত দেহ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিল শকুনের ঝাঁক।

চুকনগর অতিক্রম করার সময় সদ্য গঠিত রাজাকার বাহিনীর এক কুখ্যাত কমান্ডার হারেছ ঢালী তার সাথের এক দল রাজাকার নিয়ে আমাদেরকে বন্দী করে। হারেছ ঢালীর ধারণা হয়েছিল আমরাও হিন্দু। অচিরেই সে বুঝতে পারলো যে, আমাদের দলের সকলেই মুসলমান। হারেছ ঢালী যদি জানতে পারতো আমরা মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য ভারতে যাচ্ছি, তাহলে আমাদের প্রত্যেককে খুন করতো। প্রায় ২ দিনের নৌ-যাত্রা শেষে আমরা সীমান্তে পৌছাতে পারি ও গভীর রাতে নৌকা যোগে দু'দেশের মধ্যবর্তী নদী পার হয়ে ভারতে প্রবেশ করি। কয়েকদিন ইলা মিত্রের বাড়িতে বিশ্রাম নিয়ে টাকির সোদপুর গ্রামে একটি বাগান বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে আশ্রয় নিই। সেখানেই প্রথম অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

মে মাসের শেষ দিকে আমরা ভারতীয় সীমান্ত এলাকায় প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করি। একসময় আমাকে উন্নততর সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য বিহারের চাকুলিয়া ক্যান্টনমেন্টে পাঠানো হল। ২৪ দিন প্রশিক্ষণ শেষে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদসহ বাংলাদেশে প্রেরণের জন্য আমাদের প্রায় ৪০০০ মুক্তিযোদ্ধাকে পশ্চিম বাংলার কল্যাণী শহরে জড়ো করা হয়। কল্যাণী থেকেই এফ.এফ. প্রশিক্ষণে ভালো করার পুরস্কার হিসেবে আমাকে সহ প্রায় ৫০ জনের একটি দলকে পুনরায় ভারতীয় নৌ-বাহিনীর তত্ত্বাবধানে নৌ-কমান্ডো প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচন করা হয়।

প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠরা ছিলাম স্কুলের ছাত্র। নৌ-কমান্ডোদের মূল লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানীদের রসদ পরিবহণে নিয়োজিত জাহাজ বহরের পথ রুদ্ধ করা। এ কাজে সফলতা অর্জনের জন্য আমাদের দিনে ও রাতে যুদ্ধ করার ওপরে নিবিড় প্রশিক্ষণে দক্ষ করে তোলা হয়। নভেম্বর মাসেই দেশের অধিকাংশ স্থান মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছিল। মুক্তিযুদ্ধ শেষে আমি সহযোদ্ধাদের সাথে বাংলাদেশে ফিরে আসি এবং পড়াশোনায় মনোযোগী হই।

১৯৮৩ সালে আমি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থাপত্যে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করি। বর্তমানে আমি একজন স্থপতি হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করছি। স্থপতি হিসেবে আমি কুয়া অঞ্চলের অসংখ্য বধ্যভূমির মনুমেন্ট ডিজাইন করার সুযোগ পেয়েছি।

সম্প্রতি আমি পিরোজপুরে বাংলাদেশ পুলিশ সুপারিনটেন্ডেট কার্যালয় চত্বরে নন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদের পিতা মরহুম ফয়জুর রহমান আহমেদের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে একটি মনুমেন্টের নকশা করার সুযোগ পেয়েছি। এছাড়াও আমি বাংলাদেশ পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরের নকশা প্রণেতা এবং নির্মাতা। এ প্রকল্পটি ১৭ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করবেন বলে পরিকল্পনা রয়েছে।

বর্তমানে বিভিন্ন স্কুল ও মাদ্রাসায় উপস্থিত হয়ে আগামী প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের বীরগাথা বর্ণনার জন্য অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে আমিও দায়িত্ব পালন করছি। এছাড়াও আমি বেসরকারি সাহায্য সংস্থা **হ্যাবিট্যাট এন্ড ইকনোমি লিফটিং প্রোগ্রাম (হেল্‌প)**-এর সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছি।

ফকীর আব্দুল জব্বার (কেকেএস)
মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি

১৯৭১ সালের ২১ এপ্রিল বুধবার ভোর সাড়ে ৫টা। পাকিস্তান বাহিনী গোয়ালন্দে মুক্তিযোদ্ধা ও ইপিআর-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বোমার প্রচণ্ড আওয়াজ শুনে আমি ফকীর আব্দুল জব্বার এসডিও-এর কাছ থেকে প্রেরিত থ্রি নট থ্রি রাইফেল নিয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে যাই। আমি গোয়ালন্দ

মালখানায় গিয়ে দেখতে পাই আনছার কমান্ডার ফকীর মহিউদ্দিন আনসারদের মালখানা থেকে অস্ত্র বের করে দিচ্ছে। আমি জানতে পারি সরদার পাড়ায় ইপিআর বাংকার করে পাকিস্তান বাহিনীর মোকাবেলা করছে। ভীষণ গোলাগুলি হচ্ছে। আমি পিছন দিকে সরদার পাড়ার পাশ দিয়ে বাংকারে গিয়ে উঠলাম। সেখানে ইপিআরদের পাশাপাশি আনসার সদস্যরাও গুলি করার জন্য প্রস্তুত ছিল। আমি অনেক কষ্টে ঐ বাংকারে ঢুকলাম। এর মধ্যে একটি গানবোট একটি অস্ট্রিচ স্টিমার চর কর্ণেশোনায় এক বাহিনী আর্মি নামিয়ে দিল। সাঁড়াশি আক্রমণ শুরু হল। কর্ণেশোনা থেকে ঐ বাহিনী গোয়ালন্দ ঘাটের দিকে এগিয়ে আসছিল। তারা দূর থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের দিকে ছয় ইঞ্চি মর্টার মারছে। এক পর্যায়ে গানবোট আর অস্ট্রিচ স্টিমার প্রায় তাদের সামনে চলে এলো।

মুক্তিযোদ্ধারা তখন বাংকার থেকে থ্রি নট থ্রি অস্ত্র দিয়ে গানবোটের ওপর গুলি করতে শুরু করলো। পাকিস্তানী আর্মিরা তখন বাহাদুর পাড়া যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে গোয়ালন্দ ফেরি ঘাটে চলে গেল। ইতোমধ্যে একজন ইপিআর বাংকার ছেড়ে পাশের একটি ঘরের মধ্যে গিয়ে বেসামরিক পোশাক পরে রাইফেল রেখেই পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তখন আমি ঐ রাইফেলটি হাতে নিই এবং নিজের থ্রি নট থ্রি দিয়ে গানবোটের ওপর আক্রমণ করি। যুদ্ধের শুরুতে কিছু ইপিআর আর্মসসহ গোয়ালন্দে আশ্রয় নেয়। সেই সময় আমি একজন ছাত্রনেতা হিসেবে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ছিলাম। একজন ভলান্টিয়ার হিসেবে ইপিআরদের খাবারের দায়িত্ব তখন আমার ওপর ন্যস্ত ছিল। এক সময় ইপিআররা কিছু অবাঙালিদের গুলি করে হত্যা করে। আমি তাদের বাধা দিই। ইপিআররা আমার সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করে। আমি ওখান থেকে চুয়াডাঙ্গা চলে যাই। চুয়াডাঙ্গা গিয়ে বাংলাদেশের আর্মি ক্যাম্পে রিপোর্ট করি। সেখান থেকে থানায় ফোন করলে অবাঙালিদের নিধন বন্ধ হয়। গোয়ালন্দে ঐ দিন নাম না-জানা অনেক নারী-পুরুষ শহীদ হয়েছিলেন।

এক পর্যায়ে আমি রাইফেল নিয়ে বসন্তপুরের দিকে যাচ্ছিলাম। পথে গোয়ালন্দ টেক্সটাইল মিলের শ্রমিক ফুটবলার মুক্তিযোদ্ধা আমজাদ হোসেনের সাথে দেখা হল। তিনি আমাকে বললেন, আমি দু'টি রাইফেল নিয়ে যেতে পারছি না। একটি রাইফেল কমান্ডার আজিজুলের। আমি দু'টি রাইফেল ঘাড়ে ও একটি হাতে নিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে একসময় বসন্তপুরের উদয়পুর গ্রামে আজিজা খানমদের (বর্তমান জিলা স্কুলের হেড মাস্টার) বাড়িতে পৌঁছে দিলাম। সেখান থেকে আমি ছদ্মবেশে

বালিয়াকান্দি চলে গেলাম। সেখানে আমি বিল পাকুরিয়ার তমসেল চেয়ারম্যানের বাড়িতে ১০ দিন কাটালাম। এক রাতে আমি আজিজা খানমদের বাড়িতে রেখে আসা অস্ত্র ৩টি আনতে গেলাম। অস্ত্র নিয়ে ফেরার পথে ওভারব্রীজ পাহারারত রাজাকাররা আমাকে ধরে ফেলে। ওইখানে রাজাকার ছাড়াও স্থানীয় লোকজন ছিল। তারা আমাকে দেখে অবাক হয় এবং নদীর পাড়ে ছেড়ে দেয়।

আমি ২৩ এপ্রিল রাতে আমার মামাবাড়ি বরাটে অবস্থান নিই। সেখান থেকে আমি প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্য কলকাতা যাই। প্রশিক্ষণ শেষে দেশে ফিরে আবারও যুদ্ধে অংশ নিই। সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে কাজীরহাটে পাকিস্তান বাহিনী আমাদের নৌকার ওপর গুলি বর্ষণ করে। আমরা তখন নৌকা থেকে নেমে পড়ি এবং নদীতে খালি নৌকা ছেড়ে দিই। নৌকা ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানী আর্মিরা গুলি চালিয়েছে।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলে আমি নিজ বাড়িতে ফিরে আসি। ইতোমধ্যে আমি সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতা ও এলাকার জনগণকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি। তিনি ১৯৭২ সালে পূর্ব উজানচরে হাবিল মন্ডল পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি। এছাড়াও একই বছরে আমি রাজবাড়ী শেরে বাংলা গার্লস স্কুল ও গোয়ালন্দ শহীদ স্মৃতি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছি। আমি ১৯৮৫ সালে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান **কর্মজীবী কল্যাণ সংস্থা (কেকেএস)** প্রতিষ্ঠা করি। বর্তমানে আমি এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছি।

এস. এম. হারুন অর রশীদ লাল (সলিডারিটি)

আমার প্রাণের মুক্তিযুদ্ধ

১৯৫৪ সালের ৩ জুন কুড়িগ্রামের নতুন শহর এলাকায় বেপারী পাড়ায় আমার জন্ম। পিতা জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ ও মাতা মোছাম্মৎ আমেনা খাতুন। আমি রংপুর আইন মহাবিদ্যালয় থেকে স্নাতক ১ম পর্ব ও এশিয়ান ইউনিভার্সিটি থেকে সরকার ও রাজনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করি।

এছাড়া সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, শ্রীলঙ্কা ও নেপালে বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর কোর্সে অংশগ্রহণ করি।

ছাত্র জীবনে আমি ১৯৬৬ সালে স্কাউট এবং ১৯৬৭ সালে ট্রুপ লিডার এবং ১৯৬৮ সালে গুনাইগাছ জাম্বুরীতে মহকুমা কন্টিনজেন্ট লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। আমি ১৯৬৮-১৯৭০ পর্যন্ত কুড়িগ্রাম রিভারভিউ উচ্চ বিদ্যালয়ের স্কাউট দলনেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি এবং রাজশাহীসহ বিভিন্ন জাম্বুরীতে নেতৃত্ব প্রদান করে প্রথম শ্রেণীর স্কাউট হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছি।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ডাকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ২৮ মার্চ কুড়িগ্রাম মহকুমা বেসরকারি হাই কমান্ড গঠিত হয়। আমি হাই কমান্ডার মহিউদ্দিন আহমেদ-এর নেতৃত্বে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে সশস্ত্র অংশগ্রহণ করি। আমি ত্রিমোহনী, খলিলগঞ্জ, নিউ টাউন প্রশাসনিক এলাকার প্রতিরোধ যুদ্ধে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেছি। এক পর্যায়ে আমি সুবেদার মেজর আরব আলীর কোম্পানীতে যোগ দিয়ে রাজারহাট, ফুলবাড়ি থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যাই। জুন মাসে আমি ৬নং সেক্টরের কমান্ডার, বিমান বাহিনীর উইং কমান্ডার খাদেমুল বাশার-এর নেতৃত্বে 'এমএফ- বাহিনীর 'এ' কোম্পানীতে যোগ দিই ও ভারী অস্ত্র চালনায় শিক্ষা লাভ করি। আমি কুড়িগ্রাম ও রংপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি।

১৯৭২ সালে আমি সাক্ষরতা কার্যক্রম ও দেশে কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে অংশগ্রহণ, দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় লঙ্গরখানায় এবং বাড়ি বাড়ি খাদ্য সরবরাহ, ধান সংগ্রহ, কৃষি সমবায় খামার গড়ে তোলার কাজে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত অংশগ্রহণ করেছি।

১৯৭৪ সালে আমি শিশুদের জন্য ছিন্নমুকুল, বৃদ্ধদের জন্য অচলায়তন এবং ১৯৭৬ সালে মহিলা কলেজ কুড়িগ্রামে ছাত্রী হোস্টল নির্মাণ, কুড়িগ্রাম স্টেডিয়ামসহ নানা প্রতষ্ঠানের অবকাঠামো নির্মাণের জন্য কুড়িগ্রাম ডেভেলপমেন্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলায় ভূমিকা রেখেছি। ১৯৭৮ সালে টেরে ডেস হোমস (সুইজারল্যান্ড) এ যোগদান করে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত সুনামের সাথে সমাজকর্মী হিসেবে উচ্চপদে কাজ করেছি এবং শিশু পুনর্বাসনে অবদান রেখেছি। ১৯৯১-১৯৯২ সালে আমি **সলিডারিটি** সংস্থাটি

প্রতিষ্ঠা করে দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে কুড়িগ্রাম জেলার উন্নয়ন ধারায় যুক্ত রয়েছি। আমার পিতাও ছিলেন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মহান মুক্তিযুদ্ধে কুড়িগ্রাম মহকুমা সংগ্রাম পরিষদ সদস্য এবং মহকুমা হাইকমান্ডের অন্যতম কমান্ডার। তিনি কুড়িগ্রামে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। আমার মাতা প্রয়াত মোছাম্মৎ আমেনা খাতুন গৃহিণী ছিলেন। তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধে কোন শরণার্থী পরিবারের হারিয়ে যাওয়া শিশুকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করে স্নাতক পর্যন্ত পড়ালেখা করান এবং অন্যান্য সন্তানের সাথে তাকেও সম্পত্তিতে সমান অংশীদার করেন ।

আমার ভাই, ভাবী এবং তাদের সন্তানেরা সকলেই উচ্চ শিক্ষিত। আমার স্ত্রী প্রয়াত শামসুন নাহার চৌধুরী সানু, কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রধান ছিলেন। কুড়িগ্রামে নারী আন্দোলন ও সমাজ কর্মে তিনি অনন্য অবদান রেখেছেন। তিনি একজন গবেষক হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংগ্রহ ও রচনায় গাজীপুর জেলার প্রায় ২০০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা, বীরাঙ্গনা ও সংগঠকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। আমাদের একমাত্র সন্তান কন্যা। তিনি আশিয়ান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ঢাকায় এমবিবিএস ৫ম বর্ষের ছাত্রী। আমি দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে **সলিডারিটি** সংস্থাকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় পরিচালনা করে যাচ্ছি। আমি সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। এছাড়াও আমি সংস্থার নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছি। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কুড়িগ্রাম জেলা ইউনিট কমান্ড, কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসন, রংপুর সাহিত্য পরিষদ আমাকে বিভিন্ন সময় সম্মাননা প্রদান করেছে।

ড. মোহাম্মদ আহ্‌সান আলী (আশ্রয়)

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি

১৯৫০ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জে আমার জন্ম। তখন পূর্ব পাকিস্তানে নিম্নবিত্ত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় পর্যায়ে ছিল। পাকিস্তানী সামরিক শাসকের শোষণ, নিষ্ঠুরতা এবং হীন দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে সমগ্র জাতি ১৯৫২ সালের মাতৃভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে একক মর্যাদা ও রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তোলে।

১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে একটি স্বাধীন দেশের জন্য সংগ্রাম শুরু হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে আমিও সেই সময়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ি। ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চের সেই ভয়াল রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল (বর্তমানে সার্জেন্ট জহুরুল হক) হল থেকে বের হয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র আন্দোলন কমিটির নির্দেশ মোতাবেক পায়ে হেঁটে ২ দিনে আমরা চার জন (দুইজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও দুইজন বুয়েটের ছাত্র) চাঁপাইনবাবগঞ্জ হয়ে পশ্চিমবঙ্গে মালদহ যাই। সেখান থেকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যাই এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। প্রশিক্ষণ শেষে আমার নেতৃত্বে ১১ জনের BLF বা মুজিব বাহিনীর সদস্য নিয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করি। এই যুদ্ধে আমার টিমের দুইজন সংগ্রামী মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন।

ব্যক্তি জীবনে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত। নৃবিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষকতা ও গবেষক হিসেবে উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র অঞ্চলের আদিবাসীদের নিয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কাজ ২৩ বছর ধরে করে চলেছি। ২৩ বৎসরের এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় মনে হয় আদিবাসীদের গবেষণাকেন্দ্রিক উন্নয়ন কার্যক্রম একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দেশ সেবারই এক মহান প্রয়াস। আমি **আশ্রয়** নামে একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসেবেও বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছি।

এ বি এম সিদ্দীক (পদক্ষেপ)

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ

স্বাধীনতার স্থপতি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। নিজেদেরকে প্রশিক্ষিত করার জন্য ১২৯ জনের একটি দলে ভারতে গমন করি। ভারতে পৌছুতে আমাদের নানা রকম

অভিজ্ঞতা হয়। যাত্রার শুরুতে আমরা গৈলা, আগৈলঝড়া, বরিশাল হয়ে পয়সার হাট মুক্তিযোদ্ধা হাসপাতালে পৌছাই। পয়সার হাট ক্যাম্পে মাত্র ৩০ মিনিট অবস্থান করি এবং রাত ১০টায় নৌকায় চড়ে আমরা ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি। পরের দিন ভেন্না বাড়ি, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ পৌছাই। ঐদিন সন্ধ্যা ৭টায় যশোর জেলার গঙ্গারামপুর গ্রামে পৌছাই। গঙ্গারামপুরে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে জানতে পারলাম যে, সামনে বিপদ রয়েছে। তাই মুক্তিযোদ্ধাদের নির্দেশনায় আমাদের দু'দিন সেখানেই অবস্থান করতে হল।

তারপর সেখান থেকে আমরা যশোর জেলার বড়ইচড়ার উদ্দেশ্যে নৌকাযোগে রওনা করি। বড়ইচড়া পৌছাতে সকাল ৫টা বেজে যায়। নৌকা যাত্রা শেষ করে পায়ে হেঁটে যশোর জেলার কালিগঞ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি। সকাল ১০টায় আমরা একটি বিশাল বটগাছের নিচে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সামনের দিকে এগোই। পথে এক জায়গায় রাত কাটাই। খুব ভোরে যশোর জেলার কালিগঞ্জ বাজারে গিয়ে পৌছাই। সেখানে রাজাকারদের ধাওয়া খেয়ে বাজার থেকে দুই কিলোমিটার দূরে একটি বড় চাতাল ঘরে পৌছাই। তারপর সেখানকার আখ ও পাট ক্ষেতে লুকিয়ে থেকে দিন পার করি। রাত ৮টায় আবার চাতাল ঘরে অবস্থান করি। ততক্ষণে হাজার হাজার শরণার্থী পিপীলিকার মত দল বেঁধে ভারতের উদ্দেশ্যে ছুটছে। আমরাও তাদের সাথে একত্র হয়ে দল বেঁধে ছুটলাম।

সামনে আড়পাড়া, যশোর জেলার সি.এন্ড.বি রোড এবং তার আধা কিলোমিটার সামনে রেল লাইন। মাঝের আধা কিলোমিটার স্থান অত্যন্ত পিচ্ছিল এবং ঝুঁকিপূর্ণ। আমরা যখন ঐ আধা কিলোমিটার পার হচ্ছি তখন একদল মুক্তিযোদ্ধা ভারত থেকে ট্রেনিং শেষে সি.এন্ড.বি. রাস্তায় এসে পৌছে এবং বিপদমুক্ত এলাকা সংকেত হিসেবে এক রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে। অন্যদিকে ভারত থেকে ট্রেনিং নিয়ে আসা আরেকটি গ্রুপ ট্রেন লাইনের ওপরে এসে বিপদমুক্ত সংকেতকে পাক বাহিনীর গোলাগুলি মনে করে তারাও পাল্টা গুলি শুরু করে। আমরা তখন প্রাণের ভয়ে ছুটোছুটি করছিলাম। হঠাৎ করে দুই দলের সবুজ সংকেত বিনিময় হলে পরিস্থিতি শান্ত হয়। আমরা সামনের দিকে দৌড়ে যাই। এরপরে কিছুদূর এগোতেই শেষ রাতের দিকে ধান ক্ষেতের

মাঝখানে হাতে ত্রিশুল, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে তিলক আঁকা ও মাথায় জটা বাঁধা এক সাধুর দেখা পাই। তিনি আমাদেরকে একটি বিপদমুক্ত পথের সন্ধান দেন। আমরা ঐ পথে কিছুদূর এগোতেই পাক সেনাদের ছাউনি দেখতে পাই। আমরা দৌড়ে প্রাণ বাঁচাই।

পরদিন বিকেল নাগাদ আমরা যশোর জেলার গোবিন্দপুর পৌছালাম। সেখানে একটি বিশাল জলাশয় পার হয়ে হাঁটতে শুরু করলাম, সন্ধ্যা নাগাদ বনগাও বর্ডার দিয়ে ভারতে প্রবেশ করতে সক্ষম হলাম। সেখানে একটি বাড়িতে এক টাকার বিনিময়ে মাপা ডাল ভাত ও বাঁশের চালির ওপরে শুতে দিল। যাত্রার দিন হতে আজ পর্যন্ত এই ৯-১০ দিন পর আমরা ভারতে প্রবেশ করলাম। পরের দিন আমরা বনগা বর্ডার পার হয়ে সোজা কলকাতার কল্যাণগড় ক্যাম্পে পৌছাই। সেখানে দুই দিন থেকে আমরা কলকাতার অশোকনগর ক্যাম্পে চলে যাই। সেখানে এক মাস রাজনৈতিক সচেতনতার ওপরে প্রশিক্ষণ শেষে একটি বাছাই পরীক্ষা হয়। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের বিহারের চাকুলিয়া আর্মি ক্যান্টনমেন্টে গেরিলা প্রশিক্ষণের জন্য অতি সংগোপনে পাঠানো হয়।

আমরা সেখানে ২৮ দিনের গেরিলা ট্রেনিং শেষ করে কলকাতার বেগুনদিয়া অপারেশন ক্যাম্পে চলে আসি। সেখান থেকেই আমরা আনুমানিক ৪০-৪২ জনের একটি দল নভেম্বর মাসে সাতক্ষীরা হয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাথে বাংলাদেশে প্রবেশ করি। পরবর্তী কালে রহমতপুর (যা বর্তমানে বরিশাল ক্যাডেট কলেজ হিসেবে পরিচিত) ক্যাম্পে এসে মেজর জলিল ও ক্যাপ্টেন ওমর-এর নেতৃত্বে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করি। নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলে নিজ এলাকায় ফিরে আসি এবং যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে মনোযোগী হই। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে আমি **পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র**-এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি।

জনাব মঞ্জুর রহমান বিশ্বাস (এনইএফ)

চেতনায় মুক্তিযুদ্ধ

আমি মঞ্জুর রহমান বিশ্বাস ১৯৫০ সালের ২২ নভেম্বর পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার চরমিরকামারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করি। আমার বাবা মরহুম জসিম উদ্দীন এবং মাতা মরহুম নূরজাহান বেগম। আমি ১৯৭০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য ঢাকা আসি কিন্তু ১৯৭১ সালে যুদ্ধ শুরু হলে পুনরায় পাবনা ফিরে যাই। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমার বয়স ছিল ২০ বছর। যুদ্ধের শুরুতে আমি এবং ঈশ্বরদীর আব্দুস ছাত্তার খান, রফিকুল ইসলাম রবি ও মাহাবুবুর রহমান ডাবলু এই চার জন একত্রে গ্রামের বাড়ি থেকে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হই। পথে খরস্রোতা পদ্মা নদীতে ৪০/৫০ জন যাত্রী নিয়ে আমাদের নৌকা ডুবো চরে বেধে গেলে নৌকার দু'জন যাত্রী পদ্মার পানিতে হারিয়ে যায়। এরপর আমরা কুষ্টিয়ার আলাহ দরগা হয়ে পায়ে হেঁটে ভারতের জলঙ্গী শরণার্থী শিবিরে পৌছাই। সেখানে ১ দিন অপেক্ষার পরে করিমগঞ্জের কেচুয়া ডাঙ্গার মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুটিং ক্যাম্পে যাই। ঐ ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিলেন পাবনা জেলার দুইজন এমএনএ মরহুম মহীউদ্দীন সাহেব ও মরহুম তফিজউদ্দীন সাহেব। সেখানে ৩ দিন অপেক্ষা করার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত ক্যাম্প ইনচার্জদের মিটিং-এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমাকে ছাত্রনেতা হিসাবে মুক্তিযোদ্ধা বাছাইয়ের কাজের জন্য রেখে দেয়া হয়। অন্যরা সবাই ট্রেনিং-এ চলে যায়। সেখানে মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং নেওয়ার জন্য পাবনা জেলার মরহুম ইকবাল, বকুল, মকবুল হোসেন সন্টু, নূরুজ্জামান বিশ্বাস, বেবী ইসলাম, লালু সহ আরো অনেককের সাথে দেখা হয়। ট্রেনিং শেষে এদের মধ্যে মরহুম ইকবাল পাবনা জেলা মুজিব বাহিনীর প্রধান ও মকবুল হোসেন সন্টু পাবনা জেলা কমান্ডার হিসাবে দায়িত্ব পান।

মরহুম তাজউদ্দীন সাহেব, অধ্যাপক ইউসুফ আলী, নূরে আলম সিদ্দিকি, শাহজাহান সিরাজ ও আব্দুর রাজ্জাক সাহেব বিভিন্ন সময়ে ক্যাম্প পরিদর্শনে আসেন এবং এই ক্যাম্পের মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রহের কার্যক্রমের ভূয়সী প্রসংশা করেন। ট্রেনিং ক্যাম্পে থাকা অবস্থায় উচ্চতর লিডারশিপ ট্রেনিং এর জন্য আমাকে মনোনীত করা হয়। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে ঐ ট্রেনিং-এ আর যাওয়া হয়নি। ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে আমি শিলং-এ ট্রেনিং এ চলে যাই এবং ট্রেনিং শেষে বাংলাদেশে প্রবেশ করি। ঐ সময়ে ঈশ্বরদী উপজেলার ঢালার চরে অবস্থান কালীন হার্ডিঞ্জ ব্রিজ বিধ্বস্ত হয়। তার বেশ কিছুদিন পরে মুলাডুলি পাবনা ও ঈশ্বরদীর কিছু অংশে মুক্তিযোদ্ধা ও মুজিব বাহিনীর সঙ্গে পাক বাহিনীর যুদ্ধ হয় এবং সেখানে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পাঁচ দিন আগে এক যুদ্ধে আমার বন্ধু মান্নানসহ আরও অনেক শহীদ হয়। আমি যখন ভারতের মাটিতে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলাম তখন আমার বাড়ীতে রাজাকার ও পাক আর্মি রেইড দেয়। সারা রাত বাড়ি ঘিরে রেখে ভোর রাতে বাড়ি সার্চ করে, কিন্তু আমাকে না পেয়ে বাড়ির সবাইকে বিভিন্নভাবে অত্যাচার করে।

মোঃ সামছুল হক (একেকে)

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ

১৯৪৯ সালের ১ মে পিতার কর্মস্থল কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দিতে আমার জন্ম। আমার পিতা মরহুম খোরশেদ হক ছিলেন পেশায় পুলিশ কর্মকর্তা। আমার মা মরহুম হাসিনা বেগম ছিলেন গৃহিণী। আমি ১০ ভাই-বোনের মধ্যে ৬ষ্ঠ। মাত্র ৭ বছর বয়সে বাবা মারা যাওয়ার পর সেজ ভাই আমার ভরণ পোষণের দায়িত্ব নেন। তার সান্নিধ্যেই আমি বড় হয়ে উঠি। মায়ের মুখে বাবার কথা শুনে শুনে বাবাকেই প্রিয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে ভাবতে শিখেছি। কৈশোরে আমি অত্যন্ত চঞ্চল ছিলাম। সারাদিন বন্ধুদের সাথে খেলা করে, মাছ ধরে সময় কাটতাম। আমি ফরিদপুরের ময়েজউদ্দীন উচ্চ বিদ্যালয় হতে ১৯৬৮ সালে মাধ্যমিক পাশ করি এবং ১৯৭১ সালে কামারখালী কলেজ, ফরিদপুর হতে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করি। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের গণহত্যার পর আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিই। এরপর স্বদেশ মাতৃকাকে মুক্ত করার প্রত্যয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি।

মুক্তিযুদ্ধকালে ১৫ অক্টোবর পশ্চিম বাংলার বহরমপুর থেকে ৩৮ জন তরুণ যুবক সূচনা করেছিলেন 'বিশ্ব বিবেক জাগরণ পদযাত্রা'। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনে তারা পায়ে হেঁটে দিল্লি যাত্রা করেন। এই পদযাত্রায় আমি অংশগ্রহণ করি। আমি ভারতের বিহারে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। এ সময়ে আমি একদল বিহারী দ্বারা আক্রান্ত হই। নিজের বুদ্ধিমত্তা এবং স্থানীয় সাঁওতালদের সহযোগিতায় আমি বেঁচে যাই। প্রশিক্ষণ শেষে আমি দেশে ফিরে আসি এবং সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। আমি ৮ নম্বর সেক্টরে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম । যার সেক্টর কমান্ডার ছিলেন জনাব মোঃ খালেক, শরণার্থী ক্যাম্প, পারমাদুনিয়া, বনগাঁ, ২৪ পরগণা, পশ্চিম বাংলা। দেশ মাতৃকার টানে নিজের জীবন বাজি রেখে আমরা সংগ্রাম করেছিলাম।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমি কর্মজীবনে প্রবেশ করি। কর্মজীবনের শুরুতে সোনালী ব্যাংকের অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। সাফল্যের সাথে আমি এই ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় কর্মরত ছিলাম। চাকুরি জীবনে আমি একাধিক বার পদোন্নতি পেয়েছি। ২০০২ সালে আমি কর্মজীবন হতে অবসর গ্রহণ করি। এরপর থেকে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে যুক্ত থেকে একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নানাবিধ কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছি। দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াতে আমার ভালো লাগে। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে আমি বাই-সাইকেলে চড়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতাম। একজন ফুটবলার হিসেবেও আমি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছি। আমার দুই ছেলে ও তিন মেয়ে। আমি সপরিবারে ফরিদপুরে নিজ বাড়িতে বসবাস করছি। বর্তমানে আমি ফরিদপুরস্থ বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা **আমরা কাজ করি**-এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করছি। ভবিষ্যতে দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ-শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ দেখে যেতে চাই। পাশাপাশি তরুণ সমাজের নিকট প্রত্যাশা, আমরা যে আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যয় নিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছিলাম তা যেন তারা অক্ষুণ্ন রাখে।

ডাঃ এ এফ এম সাখাওয়াৎ (আরচেস)

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা

আমি ডাঃ এ এফ এম সাখাওয়াৎ হোসেন বর্তমানে কার্ডিওলজি বিভাগের প্রফেসর ও হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট এবং ডাইরেক্টর, ক্লিনিক্যাল হিসাবে কর্মরত আছি ঢাকাস্থ ডাঃ সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটালে। আমার জন্ম ১৯৫২ সালের ২ জুন চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা থানাধীন বিষ্ণুপুর গ্রামে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার বয়স ছিল আঠরো বছরের মত । সেই সময় আমার বাবা দামুড়হুদা থানার কার্পাশডাঙ্গা গ্রামে ন্যাশনাল ডাক্তার হিসাবে চেম্বার প্র্যাকটিস করতেন ও কার্পাশডাঙ্গা জুনিয়র হাইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন। ১১ জন ভাই-বোনের মধ্যে আমি মেজো। আমার বড় ভাই ড. মাহবুব হোসেন, বিআইডিএম-এর সাবেক মহাপরিলক ও ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক তথা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। আমার ছোট ভাই এ এফ এম ফারুক হোসেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব। অন্য দুই ভাই যথাক্রমে ইফতেখার হোসেন ও মনির হোসেন দু'টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। বোনেরা সবাই উচ্চ শিক্ষিত এবং যে যার যোগ্যতায় তাদের স্বামী সন্তান নিয়ে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠত। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি ঢাকা কলেজের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষাথী ছিলাম। ২৫ মার্চ পাকবাহিনীর বর্বরতা ও গণহত্যার কারণে এপ্রিলে অনুষ্ঠিতব্য আমাদের এইচ এস সি পরীক্ষা ১৯৭১ সালে দেয়া সম্ভব হয়নি। তাই এপ্রিলের ১ম সপ্তাহে আমি ঢাকা থেকে চুয়াডাঙ্গার পথে পাড়ি জমাই এবং দুরুহ যাতায়াত ব্যবস্থা ও পাক সেনাদের কড়া নজরদারির মধ্যে অনেক কষ্টে ২/৩ দিন পর চুয়াডাঙ্গা পৌছুতে সক্ষম হই। তখনও চুয়াডাঙ্গা মুক্ত এলাকা। ১৪ ও ১৫ এপ্রিল চুয়াডাঙ্গায় পাক সেনারা বোম্বিং শুরু করে। তখনই আমরা পুরো পরিবার কার্পাসডাঙ্গা থেকে বর্ডার পার হয়ে ভারতের নদীয়া জেলার চাপড়া-বাঙালি গ্রামে চলে যাই শরণার্থী হিসেবে। সেখানে অবস্থান নিই আমার নানা-নানীর বাড়িতে। সেখানে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস আমি আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে তাঁদের পরামর্শ ও সহযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধের একজন সংগঠক হিসেবে কাজ করতে থাকি যথাক্রমে চাপড়া-বাঙালি শরণার্থী ক্যাম্প, বাঙালি ইয়্যুথ ক্যাম্প, হাটখোলা ও রানাবন্ধ ক্যাম্পে। মুক্তিযুদ্ধের ঐ দিনগুলোতে নদীয়ায় অবস্থান করে মুজিবনগর সরকারের অধীনে ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলাম-এর পরিচালনায় প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ভলানটিয়ার সার্ভিস কোরের রানাবন্ধ ক্যাম্পের ইনচার্জ বা ক্যাম্প অর্গানাইজার হিসেবে কর্মরত থাকি। মাঝে মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের ৮নং সেক্টরের বিভিন্ন মুক্তাঞ্চলে গিয়ে জনগণের মাঝে মোটিভেশন ওয়ার্ক করতে থাকি। BVSC তথা বাংলাদেশ ভলানটিয়ার সার্ভিস কোরের রিজিওনাল ম্যানেজার জনাব রফিকুল ইসলাম মুসা ভাই-এর নির্দেশনামত আমরা শরণার্থী ক্যাম্পে ও মুক্তাঞ্চলে সাংগঠনিক কাজ করতাম। এভাবেই মহান মুক্তিযুদ্ধে ৮নং সেক্টরের বিভিন্ন অঞ্চলে কাজ করতে থাকি। এক সময় ১৬ ডিসেম্বর আমরা বিজয়ের স্বাদ পাই। বর্তমানে আমি হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কার্ডিওলজিস্ট হিসেবে মুক্তিযোদ্ধা চিকিৎসক পরিষদের কোষাধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পালন করছি। আমি মুক্তিযোদ্ধা কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের অধীনে মুক্তিযোদ্ধা চিকিৎসক কমান্ডের একজন সক্রিয় সদস্য। এছাড়া বর্তমানে বেসরকারি সংস্থা **আরচেস**-এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। আমি বি.এম.এ, বিপিএমপিএ ও বাংলাদেশ কার্ডিয়াক সোসাইটির আজীবন সদস্য এবং ঢাকাস্থ চুয়াডাঙ্গা জেলা সমিতির আজীবন সদস্য।

এম. এ. সামাদ (সিসিডিএ)

একজন মুক্তিযোদ্ধার কথা

আমি এম. এ. সামাদ ১৯৫১ সালের ১৫ জানুয়ারি কুমিল্লা জেলার আদমপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতা মরহুম আলহাজ্ব সুজাত আলী এবং মাতা মরহুম জয়গুন বিবি। আমি কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার রায়পুর কে. সি. উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৬৬ সালে এসএসসি এবং কুমিল্লা সরকারী ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করি। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে বি. এ অনার্স এবং এম. এ এবং ইনস্টিটিউট অব সোস্যাল সাইন্স, বুলগেরিয়া থেকে কৃষি অর্থনীনিতে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা সম্পন্ন করি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন সময়ে ছাত্র রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে মাধ্যমে ঐতিহাসিক ৬ দফা আন্দোলনসহ সকল রাজনৈতিক আন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহণ করি। ১৯৭১ সালে দেশমাতৃকাকে রক্ষায় মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। স্বাধীনতালাভের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মহসিন হল শাখা ছাত্র সংসদের নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হই। ১৯৭৪ সাল থেকে অদ্যাবধি রায়পুর কে. সি. উচ্চ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য/সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছি। ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ কৃষক সমিতির সহ-সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পাই। ১৯৯০ সাল থেকে অদ্যাবধি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা **সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স** (সিসিডিএ)-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করে আসছি।

প্রফেসর ড. মকবুল আহমেদ খান (বিজ)

মুক্তিযুদ্ধ আমার প্রেরণা

আমি প্রফেসর ড. মকবুল আহমেদ খান গোপালগঞ্জ জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করি। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে বি. এ. (অনার্স) ও এম. এ. ডিগ্রী অর্জন করি এবং মস্কো টেক্সটাইল ইউনিভার্সিটি থেকে ১৯৭৬ সালে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করি। আমি কর্মজীবনে

দেশ-বিদেশে ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছি যার মধ্যে ইংল্যান্ডের ব্রাডফোর্ড ইউনিভার্সিটি এবং নিউজিল্যান্ডের ওটাগো ইউনিভার্সিটির নাম উল্লেখযোগ্য। আমি একনাগাড়ে ১৬ বছর বিশ্বব্যাংকের টেক্সটাইল এডভাইজার হিসাবে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে কাজ করেছি। আমার প্রকাশিত গবেষণা পুস্তকের সংখ্যা ১০ এবং জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা ও পরামর্শ প্রতিবেদনের সংখ্যা ২০০-এর অধিক।

আমি ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে মুজিব বাহিনীর সদস্য হিসেবে গোপালগঞ্জ শত্রুমুক্ত করায় সক্রিয় ভূমিকা রাখি। আমি ২১ বছর বয়সে অনার্স পরীক্ষা শেষে একাত্তরের এপ্রিল মাসে প্রশিক্ষণের জন্য ভারতে যাই। প্রশিক্ষণ শেষে দেশে ফিরে ৯ নম্বর সেক্টরের অধীনে গোপালগঞ্জ থানা মুজিব বাহিনীর সক্রিয় সদস্য হিসেবে গোপীনাথপুর, ভাটিয়াপাড়াসহ বিভিন্ন এলাকায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি এবং ১৯৭১ এর ৫ ডিসেম্বর গোপালগঞ্জ শহরকে শত্রুমুক্ত করি। এরপর আমি গোপালগঞ্জ থানার প্রশাসক হিসেবে যোগদান করে ১৯৭২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করি।

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পাশাপাশি একজন সমাজ-সেবক হিসেবে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছি। আমি দেশের অন্যতম প্রধান বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা **বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিস** এর প্রতিষ্ঠালগ্ন (১৯৮০) থেকে জড়িত ছিলাম। আমার নেতৃত্বে এই প্রতিষ্ঠানটি বিগত ৩৬ বছর সাফল্যের সঙ্গে ২৯টি জেলায় দশ লক্ষাধিক দরিদ্র মানুষের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণসহ বিভিন্ন সেবামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। বিগত ৬ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় অনুমোদনক্রমে আমি ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে যোগদান করি।

আমি একাধিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছি; যার মধ্যে বাংলাদেশ প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (১৯৭৮), ফরচুন জিপার লিঃ (১৯৯৪); টেক্সটাইল স্ট্রাটেজিক ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (১৯৮৬) এবং ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ (২০১২) উল্লেখযোগ্য।

এ এস এম নূরুল আলম (আরব)

মুক্তিযুদ্ধঃ জীবনের জয়গান

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী স্বাধীনতাকামী নিরস্ত্র বাঙালি জনসাধারণের ওপর অতর্কিতে হামলা করে। এই হামলাকে প্রতিহত করে একটি স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় নিয়ে ২৬ মার্চ মানিকগঞ্জে সকল স্তরের জনগণ মিলে একটি কমিটি গঠন করে। আমি এ এস এম নূরুল আলম সেসময় মানিকগঞ্জ সরকারী দেবেন্দ্র কলেজের স্নাতক শ্রেণির শেষ বর্ষের ছাত্র। কমিটির নির্দেশক্রমে আমি স্বাধীনতাকামী ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে ঢাকা থেকে আগত শরণার্থীদের সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করি। একসময় মানিকগঞ্জের বিবেকবান দেশপ্রেমিক নাগরিক, ছাত্র সমাজসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিদের নিয়ে জেলার সরকারি কোষাগারে রাখা প্রায় ছয়শত রাইফেল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসি। এই রাইফেল দিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য প্রাথমিক প্রশিক্ষণ আরম্ভ করা হয়। পরবর্তীকালে মানিকগঞ্জের সকল স্তরের জনগণের মতামতের ভিত্তিতে ৩৬টি রাইফেল নিজেদের কাছে রেখে বাকি রাইফেল সরকারের কোষাগারে জমা দেয়া হয়। এই ৩৬টি রাইফেল স্বাধীনতাকামী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ১৯৭১ সালের ৮ এপ্রিল পাক সেনারা মানিকগঞ্জে প্রবেশ করে। সেসময় কমিটির নেতৃবৃন্দ নিজেদেরকে আরও সুসংহত করে বিভিন্ন উপজেলায় অবস্থান নেয়। এই সময় ক্যাপ্টেন (অবঃ) আব্দুল হালিম চৌধুরীর সাথে মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলায় চলে যাই। সেখানে অবস্থান করে ক্যাপ্টেন (অবঃ) আব্দুল হালিমের নির্দেশমত মুক্তিযুদ্ধে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য উৎসাহী ব্যক্তিদেরকে সংঘবদ্ধ করার কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি। পরবর্তীকালে ভারতের আগরতলা মেলাঘর ক্যাম্পে তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদেরকে সাংকেতিক চিহ্ন প্রদানের মাধ্যমে মেলাঘর ক্যাম্পে পাঠানোর কাজ অব্যাহত রাখি। এক পর্যায়ে বর্ষাকাল শুরু হলে ক্যাপ্টেন হালিম-এর সঙ্গে নৌকায় করে ও পায়ে হেঁটে জেলার বিভিন্ন এলাকায় মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রহের জন্য ব্যাপকভাবে কাজ শুরু করি। পরবর্তীকালে আগরতলা হতে আগত প্রশিক্ষিত মুক্তিযোদ্ধাগণকে ক্যাপ্টেন (অবঃ) আব্দুল হালিম চৌধুরীর নির্দেশ মতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন এলাকায় দায়িত্ব প্রদান করে থাকি। ক্যাপ্টেন-এর নির্দেশক্রমে আমি মুক্তিযোদ্ধাদের করণীয় সম্পর্কে তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে পরামর্শ পৌছে দিই। এই সময় ক্যাপ্টেন (অবঃ) আব্দুল হালিম চৌধুরীকে ঢাকা পশ্চিমের এরিয়া কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। একই সাথে মেজর হায়দার ২নং সেক্টর ও মানিকগঞ্জ এলাকায় কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন। এভাবে পর্যায়ক্রমে মুক্তিযোদ্ধাগণ মেলাঘর ক্যাম্পে যেতে থাকেন এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে মানিকগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় ফিরে এসে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ করেন। মুক্তিযোদ্ধারা গোলাইডাঙ্গা, বায়রা ও ঢাকা আরিচা মহাসড়কসহ বিভিন্ন স্থানে শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করেন। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। আমি মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একজন সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। উল্লেখ্য, আমি ১৯৬৫ সালে সিভিল ডিফেন্সের মাধ্যমে রাইফেলসহ অন্যান্য অস্ত্র পরিচালনার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলাম। বর্তমানে আমি মানিকগঞ্জে **এসোসিয়েশন ফর রুরাল এডভান্সমেন্ট ইন বাংলাদেশ (আরব)** সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছি।

কাজী আবুল বাসার (কেটিসিসিএ)

শিহরণময় মুক্তিযুদ্ধ

আমি অধ্যাপক কাজী আবুল বাসার। কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর উপজেলায় আমার জন্ম। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে উদ্বুদ্ধ হয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করি। আজও সেই গৌরব মাখা দিনের অনেক স্মৃতি স্মরণ করতে গিয়ে গা শিউরে উঠে।

২৬ মার্চ ১৯৭১ সাল। আমার বয়স তখন মাত্র ১৭ বছর। সারা দেশে কারফিউ চলছিল। চারদিকে থমথমে পরিবেশ। সারা দেশের মানুষ তখন উৎকণ্ঠায় ভীত সন্ত্রস্ত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এমন সময় তৎকালীন কুমিল্লার ছাত্র নেতা মাঈনুল হুদার নেতৃত্বে আমরা কয়েকজন একত্রিত হয়েছিলাম। উর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে নির্দেশ এলো যে করেই হউক একটি সাইক্লো-স্টাইল মেশিন সংগ্রহ করতে হবে। তখন ছাত্র নেতা মকসুদ ভাই জানালেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারী কলেজে একটি সাইক্লো-স্টাইল মেশিন রয়েছে। সেটা আনার ব্যবস্থা করতে হবে। দেরী না করে আমরা কয়েকজন কলেজে গিয়ে যে রুমে মেশিনটি রাখা ছিল সেই রুমের তালা ভেঙ্গে মেশিনটি সংগ্রহ করে এনে কুমিল্লা শহরের ঠাকুরপাড়ার ছাত্রলীগ নেতা জনাব সবুর ভাইয়ের বাড়িতে যাই। সেখানে এই মেশিনের সাহায্যে কিছু লিফলেট তৈরি করে সেগুলো সবাই মিলে কুমিল্লা শহরের বিভিন্ন অলিতে গলিতে জনগণের মাঝে বিতরণ করি এবং তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য আহবান জানাই। ইতোমধ্যে তৎকালীন কুমিল্লার গভর্নর প্রফেসর মোঃ খোরশেদ আলম, অধ্যক্ষ আবদুর রউফ, ছাত্র নেতা রুস্তম আলী এবং মোঃ মমিনুল হকসহ সবাই আমরা জনাব মোঃ রশিদ ইঞ্জিনিয়ার এম পি-এর বাসায় একত্রিত হই এবং সেখানে রাত্রি যাপন করি। পরে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারী কলেজ সংলগ্ন আওয়ামী লীগ অফিসে আমরা সবাই অবস্থান নিই। রাত সাড়ে বারোটায় প্রফেসর খোরশেদ আলম উপস্থিত সবাইকে যার যার বাসায় চলে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। নির্দেশ অনুযায়ী সবাই যার যার বাসায় চলে যায়। এরপর অধ্যক্ষ আবুল কালাম মজুমদার এম.পি-কে কুমিল্লা রেলওয়ে স্টেশন রোড সংলগ্ন তাঁর নিজ বাসায় পৌঁছে দেয়ার জন্য আমাকে এবং রুস্তম আলী ভাইকে অনুরোধ করেন। গভীর অন্ধকার রাত, এলাকায় তখন বিদ্যুত ছিল না। অনেক কষ্টে তাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে যখন আমরা বাসায় ফিরছিলাম তখন রাত ১:০০টা বাজে। এই গভীর রাতে রুস্তম আলী ভাই আমাকে একা বাসায় যেতে দিলেন না। ফলে রুস্তম আলী ভাইয়ের বাসায় রাত্রি যাপন করলাম। সারা রাত্র ছটফট করছিলাম, কোথায় কী হচ্ছে, বুঝতে পারছিলাম না। সারা রাত ঘুম হয়নি। শেষ রাতে ফজরের আজানের আগেই বাসা থেকে বের হয়ে কুমিল্লার প্রাণ কেন্দ্র কান্দিরপাড় পূবালী ব্যাংকের দক্ষিণ পাশে একটু ভেতরে আমরা অবস্থান নিই। বাসা থেকে

বের হওয়ার ঠিক দশ মিনিট পরেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি গাড়ি এসে রুস্তম আলী ভাইয়ের বাসার সামনে দাঁড়ায় এবং মুহূর্তের মধ্যেই একটি শক্তিশালী বোমা নিক্ষেপ করে বাসাটি উড়িয়ে দেয়। এই ঘটনাটি মাত্র দশ মিনিট পূর্বে ঘটলেই আমাদের দু'জনকে হয়তো পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিতে হতো। আলাহর অশেষ কৃপায় সেদিন আমরা জীবনে বেঁচে যাই। এরপর থেকে যখনই মুক্তিযুদ্ধের কথা স্মরণ করি তখনই ঐ দিনটির কথা মনে পড়ে। হয়তো জীবনে কখনও ঐ মুহূর্তটির কথা ভুলতে পারব না। তাই এটি আমার জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকল।

এমনই আরো অনেক ঘটনার মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে আমরা কাঙ্ক্ষিত বিজয় অর্জন করি। তারপর আমি আবার পড়াশুনায় মনোযোগ দিই। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারী কলেজ হতে এইচ এস সি পাশ করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ ইতিহাস বিভাগে ভর্তি হই এবং ১৯৮৩ সালে মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করি। ১৯৮৪ সালে আমি কুমিল্লা অজিত গুহ কলেজে অধ্যাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত হই। দীর্ঘ কর্ম-জীবনের অবসান ঘটিয়ে নিয়ম মোতাবেক বিগত ১ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে অধ্যাপনার দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করি। বর্তমানে আমি প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী ড. আখতার হামিদ খানের প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী কুমিল্লা বার্ড-এর প্রায়োগিক গবেষণাগার **কোতয়ালী থানা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ এসোসিয়েশন লি:**-এর সভাপতির দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছি।

আমি দুই ছেলে এবং দুই মেয়ের জনক। আমার দুই মেয়ের মধ্যে একজন ইংরেজি বিভাগে এবং অপরজন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে মাস্টার ডিগ্রী অর্জন করার পর দুইজনকেই বিয়ে দেয়া হয়েছে। ছেলে দুইজন অধ্যয়নরত। বড় ছেলে ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ, গাজীপুরে এবং ছোট ছেলে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারী কলেজে এইচ.এস.সি পড়ছে। বর্তমানে স্ত্রী ও ছোট ছেলেকে নিয়ে কুমিল্লা নিজ বাড়িতে বসবাস করছি। আমার পরিবারের সকলের জন্য আপনাদের নিকট দোয়া কামনা করছি।

মোহাম্মদ এনামুল হক (ডিইউএস)

মুক্তিযুদ্ধে আমার অংশগ্রহণ

আমি মোহাম্মদ এনামুল হক ১৯৪৪ সালের ২২ মে নোয়াখালী জেলাধীন হাতিয়া দ্বীপের চরকিং ইউনিয়নের অন্তর্গত বশির উল্যাহ মিয়ার গ্রামে জন্ম গ্রহণ করি। আমার পিতার নাম আলহাজ্ব মৌলবী বেলায়েত হোসেন এবং মাতার নাম আলহাজ্ব আমিনা বেগম।

আমি হাতিয়া দ্বীপের অন্যতম প্রাচীন প্রতিষ্ঠান আফাজিয়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে আই. এ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ (অনার্স) এবং ১৯৬৯ সালে ইতিহাসে এম. এ. ডিগ্রি লাভ করি।

আমি ছাত্র জীবনে ছাত্রলীগের একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী হিসেবে ষাটের দশকের ঐতিহাসিক ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি। এরপর ১৯৭১-এ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন ২ নং সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত হাতিয়া দ্বীপের কমান্ডার ছিলেন মোহাম্মদ ওয়ালী-উল্যাহ এবং ডেপুটি কমান্ডার ছিলেন মো: রফিকুল আলম। তাঁদের পরিচালিত ওছখালী কমিউনিটি সেন্টার ট্রেনিং ক্যাম্পে যুক্ত থেকে তৃতীয় বার সামরিক ট্রেনিং গ্রহণ করি। এর আগে আমি ইউ. ও. টি. সি সদস্য হিসাবে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে ছাত্র থাকাকালীন প্রথমবার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীন দ্বিতীয়বার সামরিক ট্রেনিং গ্রহণ করি। যুদ্ধকালীন সময়ে পুরো ৯ মাস আমি হাতিয়া রণাঙ্গনে একজন সাহসী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নিয়োজিত ছিলাম। আমি রণাঙ্গনে পাক হানাদার বাহিনীর আতঙ্ক ছিলাম। আমি কখনও সম্মুখ সমরে কখনও বা গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে শত্রু শিবিরে অতর্কিত হামলা পরিচালনা করেছি।

DAWN

WAR TILL VICTORY

Yahya's pledge

JEHAD

MEANS TOTAL COMMITMENT

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্থাপিত হাতিয়া দ্বীপের প্রথম কলেজ 'হাতিয়া ডিগ্রী কলেজ ' এবং দ্বীপের একমাত্র মহিলা কলেজ 'হাতিয়া আদর্শ মহিলা কলেজে'র প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে আমি সুদীর্ঘ ২২ বছর দায়িত্ব পালন করেছি।

আমি বর্তমানে **দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার** চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। এই সংস্থাটি বঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। প্রায় ৬০ হাজার মানুষ এই সংস্থার বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত আছেন। উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকায়ন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পরিস্থিতির উন্নয়ন-ই **দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার** লক্ষ্য।

মোঃ রফিকুল আলম (ডিইউএস)

দেশকে মুক্ত করার লক্ষ্য

আমি মোঃ রফিকুল আলম ১৫ মার্চ ১৯৫০ সালে নোয়াখালী জেলার হাতিয়া দ্বীপে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতা মরহুম এ্যাডভোকেট ফছিহুল আলম দীর্ঘ দিন হাতিয়া বার এসোসিয়েশনের সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। আমার মাতার নাম মরহুমা নূরেরনেছা। আমি ১৯৬৫-১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ঢাকা কলেজে অধ্যয়নকালীন সময়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সদস্য হিসাবে বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনে সম্পৃক্ত ছিলাম। ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধি হিসাবে আমি হাতিয়া ও রামগতি থানায় ব্যাপক গণ-সংযোগে অংশগ্রহণ করি।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালোরাত্রিতে পাক হানাদার বাহিনী ইতিহাসের নৃশংসতম গণহত্যা অপারেশন সার্চলাইট পরিচালনার মাধ্যমে নিরপরাধ ও নিরস্ত্র বাঙ্গালীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং দেশজুড়ে গণহত্যা চালায়। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পরপরই সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কেন্দ্রীয় কমান্ডের নির্দেশক্রমে আমি হাতিয়া থানায় মুক্তিবাহিনী সংগঠিত করার দায়িত্ব পাই।

১৯৭১ সালের ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত নোয়াখালী জেলা ছিল পাক হানাদার দখলমুক্ত। এপ্রিল মাসের শেষ দিকে আমার নেতৃত্বে প্রায় শতাধিক মুক্তিযোদ্ধা রাজনগর ক্যাম্পে ২ নম্বর সেক্টরে মেজর খালেদ মোশাররফের অধীনে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। পরবর্তী পর্যায়ে আমি পালাটানা ক্যাম্পে বি কোম্পানীর অধিনায়ক পদে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করি। এরপর ভারতের উত্তর প্রদেশে (দেরাদুন) অবস্থিত অল ইন্ডিয়া মিলিটারী একাডেমিতে গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। '৭১-এর জুন মাসে আমি হাতিয়া থানা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের দায়িত্বভার গ্রহণ করি।

১৯৭১ সালের ২৯ অক্টোবর এক সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পাক হানাদার দখলমুক্ত হয় হাতিয়া থানা। আমি এই অভিযানে অংশগ্রহণকারী বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলা ইউনিট এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি ইউনিটের সমন্বয়ে গঠিত বাহিনীর কমান্ডার ছিলাম। হাতিয়া থানা মুক্তির প্রাক্কালে প্রায় শতাধিক রাজাকার বন্দী হয়। এরপর আর কখনই পাক হানাদার বাহিনী হাতিয়া থানার দখল নিতে পারেনি।

১৯৭১-১৯৯০ সাল পর্যন্ত আমি হাতিয়া থানা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কমান্ডারের দায়িত্ব পালনের সময়ে ১৫০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে সরকারি খাস জমিতে পুর্নবাসন করি এবং সহস্রাধিক ভূমিহীনকে সরকারি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদানে সহায়তা করি। মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর দেশ পুনর্গঠনে আমি তিনটি

বেসরকারি কলেজ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করি। একই সময়ে আমি হাতিয়া দ্বীপে ১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ২টি হাইস্কুল পুনঃনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করি। ১৯৭৩ সালে যুদ্ধ-উত্তর বাংলাদেশ গঠনের ব্রত নিয়ে আন্তর্জাতিক রেডক্রস-এ যোগদান করি। পরবর্তীকালে ১৯৮৩ সালে **দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা** নামের একটি বেসরকারি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করি যা অদ্যাবধি বঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। প্রায় ৬০ হাজার মানুষ এই সংস্থার বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত আছেন। উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকায়ন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পরিস্থিতির উন্নয়ন-ই **দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার** লক্ষ্য।

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান (দিশা)

স্মৃতিতে মুক্তিযুদ্ধ

আমি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিতা মরহুম হাজী সাইদুর রহমান এবং মাতা মরহুমা মোমেনা খাতুন। ১৯৪৯ সালের ৪ জুলাই কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নের ছত্রগাছা গ্রামে আমার জন্ম। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। মুক্তিযুদ্ধকালীন দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের জোনাল চেয়ারম্যান তৎকালীন এমপিএ বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম আব্দুর রউফ চৌধুরীর সহযোগিতায় দেশ মাতৃকার মুক্তির অন্বেষণে বিভিন্ন কর্মসূচিতে ঝাঁপিয়ে পড়ি। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমাদের একটাই প্রতিজ্ঞা ছিল দেশ স্বাধীন করা। বিভিন্ন সময় নানা রকম বিপদসংকুল পথ পেরিয়ে সামনে এগিয়েছি। নিজের জীবনের মায়া তুচ্ছ করে দেশকে মুক্ত করার শপথ নিয়েছি। প্রায় নয় মাস সশস্ত্র যুদ্ধের পর আমরা নিজের মাতৃভূমিকে স্বাধীন করতে পেরেছি।

স্বাধীনতার পর জীবনে নানারকম সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাইনি। নিজের সততা আর নিষ্ঠা ছিলো সামনের এগোনোর শক্তি। আর তাই শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে আমি শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছি। নিজ গ্রাম ছত্রগাছাতে তৎকালীন এমপি মহোদয়ের সহযোগিতায় এবং এলাকাবাসীর প্রচেষ্টায় ছত্রগাছা মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় আমি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছি। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে আমি উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করি এবং ২০০৯ সালে শিক্ষকতা থেকে অবসর গ্রহণ করি। বর্তমানে আমি দেশের অন্যতম বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান **দিশা স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণ সংস্থার** কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছি। আমি ছত্রগাছা জামে মসজিদের সভাপতিসহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান, সামাজিক উন্নয়নমূলকসহ অন্যান্য কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত রয়েছি। দেশ মাতৃকার সাহসী সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার অভিভাবকত্ব ও সুনিবিড় পরিচর্যায় দিশা তার কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন পূরণে এগিয়ে চলেছে।

ব্যক্তিজীবনে আমি দুই সন্তানের জনক। বড় ছেলে মোঃ পপুলার রহমান এমবিএ ডিগ্রী অর্জন করে বর্তমানে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরিরত, ছোট ছেলে সৈয়দ মোঃ মাসুদ পারভেজ শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এসএসসি পাশ করে প্রতিবন্ধীদের কল্যাণার্থে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছে। আমার স্ত্রী মোছাঃ আনোয়ারা খাতুন উপজেলা সমাজসেবা অফিস, মিরপুর, কুষ্টিয়াতে কর্মরত। বিভিন্ন ব্যস্ততায় আমি পরিবারকে ঠিকমত সময় দিতে না পারলেও তিনি কখনো অভিযোগ করেননি। সুখ-দুঃখে পাশে থেকে আমাকে সব ধরনের কাজে মানসিক সাহস ও সহযোগিতা যুগিয়ে যাচ্ছেন। এজন্য আমি আমার পরিবারের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মোঃ নূরুল হক সরকার (নজীর)

অবিস্মরণীয় মুক্তিযুদ্ধ

আমার জন্ম লালমনিরহাট জেলার মহেন্দ্রনগর ইউনিয়নের হাঁড়িভাঙ্গা গ্রামে। বাবা মোঃ আকবর আলী সরকার এবং মাতা মোছাঃ নেছামন বিবি। ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের সময় আমি স্থানীয় এমপি জনাব আবুল হোসেন-এর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে আসি। এমপি সাহেবের একজন স্নেহভাজন ব্যক্তি হিসেবে আমি স্বাধীনতা পূর্ব ও পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে ভূমিকা রেখেছি। আমি ১৯৭০ সালে লালমনিরহাট সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাশ করে রংপুর জেলার তাজহাটে এগ্রিকালচার এক্সটেনশন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট-এ ভর্তি হই। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পড়াশুনা বন্ধ করে আমি যুদ্ধে চলে যাই। স্কুল কলেজে থাকাকালীন আমি একজন রাজনীতি-সচেতন যুবক ছিলাম। ১৯৭১ সালের ৬ এপ্রিল আমি নিজ বাড়ি ছেড়ে সপরিবারে এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় বাড়িতে চলে যাই। সেখানেও খান সেনাদের অত্যাচার চলতে থাকে। তারা সাধারণ মানুষের বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দেয়, মেয়েদেরকে নির্যাতন করে, যুবকদের ধরে নিয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে আমিসহ বেশ কয়েকজন যুবক আবুল হোসেন এমপি সাহেবের সাথে দেখা করি এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যোগ দেই। মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার সময় আমার সাথে ছিল মাত্র ২ কেজি চাল ও পকেটে ছিল মাত্র দেড় টাকা। প্রশিক্ষণ শেষে আমাকে ৬ বি সেক্টর ভারতের গিতালদহে ক্যাপ্টেন উইলিয়ামের নিকট (পরবর্তীতে ৬ বি সেক্টরের দায়িত্ব নেন ক্যাপ্টেন দেলোয়ার) পাঠানো হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম দিকে আমি ক্যাপ্টেন উইলিয়ামের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করি। পরবর্তীকালে কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলার নাখারগঞ্জ, তালতলা ও গাগলা ডিফেন্স-এর প্লাটুন কমান্ডার হিসেবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন সংগঠিত করার কাজে অংশ নিই।

দেশ স্বাধীন হবার পর আমি পরিবারের কাছে ফিরে আসি। আমি পুনরায় একই কলেজে ভর্তি হই এবং এইচএসসি পাশ করি। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে ইতোমধ্যে আর্থিক সংকট দেখা দেয়। আমার পরিবারেও অর্থ কষ্ট শুরু হয়। আমি কৃষি ডিপ্লোমা পাশ করার পর ১৯৭২ সালের আগস্ট মাসে **আরডিআরএস-বাংলাদেশ** সংস্থায় কৃষিবিদ হিসেবে চাকুরি জীবন শুরু করি। একজন মেধাবী ছাত্র হিসেবে যদিও আমার শিক্ষা জীবন ১৯৭৪-১৯৭৫ সালে শেষ হবার কথা ছিল, কিন্তু অর্থ কষ্টে আমি তা করতে পারিনি। ১৯৮১ সালে আমি বি.এ পাশ করি। চাকুরি জীবনের এক পর্যায়ে আমি পদোন্নতি লাভ করি এবং বিশ্বের প্রায় ২৫টি দেশ ভ্রমণ করেছি। চাকুরি সূত্রে আমি তিনটি দেশে (লাইবেরিয়া, আফগানিস্তান ও সুদান) দায়িত্ব পালন করেছি। আমি ইংরেজি, হিন্দি ও উর্দু ভাষাতেও সক্ষমতা অর্জন করেছি। বর্তমানে আমি **নজীর (নতুন জীবন রচি)** নামক একটি বেসরকারি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। সংগঠনটি এলাকার জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করে আসছে। আমার স্ত্রী একজন গৃহিণী। আমাদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। বড় ছেলে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অন্য দুই ছেলে-মেয়ে পড়াশোনা শেষ করে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত।

মোঃ নাজিবুর রহমান (এনইএফ)

মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো

আমি মোঃ নাজিবুর রহমান ১৯৫৪ সালের ১১ নভেম্বর ফরিদপুর জেলার আলফাডাংগা উপজেলার কুচিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতা মরহুম রতন মিঞা এবং মাতা ধলাবড়। আমি ১৯৬৬ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের আলফাডাঙ্গা থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিলাম।

যুদ্ধের সময় আমার বয়স ছিল ১৭ বছর। যুদ্ধ শুরুর পর ১৯৭১ সালের জুন মাসের ২০/২২ তারিখের দিকে আমি আরও ৩০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হই এবং যশোরের আড়পাড়া, বারোবাজার, বাগদা বর্ডার হয়ে বনগাঁ টালিখোলা ইয়ুথ ক্যাম্পে পৌছাই। সেখানে আমি খণ্ডকালীন প্রশিক্ষণ নেই। সেখানে আলফাডাঙ্গা থানার নাম অনুসারে 'আলফা' নামে একটি কোম্পানী হয় এবং আমাকে সেই কোম্পানীর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। মরহুম লেফটেনন্টে মতিউর রহমান ক্যাম্প কমান্ডার ছিলেন।

১৯৭১ সালের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে আমি বিহারের ক্যান্টনমেন্টে প্রশিক্ষণের জন্য যাই। তখন কোম্পানীর লিডার ছিলেন আতিউর রহমান। ১ মাস প্রশিক্ষণ শেষে আমি বীরভুম ক্যান্টনমেন্ট থেকে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টে আসি। ওখানে ৩ দিন অবস্থান শেষে আমাকে যশোরের বর্ডার এলাকার পিপে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে নেওয়া হয়। সেখানে ৫ দিন অবস্থানের পর আমি পিপে বর্ড়ার দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করি। যশোরের আড়পাড়ার কোলা নামক স্থানে আসার পর পাকবাহিনীর সাথে গোলাগুলি শুরু হয়, তাতে বেশ কয়েকজন মারা যায়। গোলাগুলির পর সেখানে একটি বাগানে আমি লুকিয়ে থাকি। ২ দিন পর সোর্সের মাধ্যমে ৩০টি নৌকা ঠিক করা হয়। সন্ধ্যার পর আমিসহ অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা রওনা হই। আড়পাড়া ব্রীজের কাছে পৌঁছালে পাকবাহিনীর সাথে আবার গোলাগুলি শুরু হয় এবং রেজাউল নামের একজন মুক্তিযোদ্ধা মারা যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পরাজিত হয়ে পাকবাহিনী পালিয়ে যায়। এরপর আমরা সবাই যশোরের নোয়াহাটা নামক স্থানে পৌঁছাই। সেখানে আমি মুক্তিযোদ্ধা মরহুম ইয়াকুব মাস্টারের বাড়িতে আশ্রয় নিই এবং ২ দিন থাকি। পরের দিন বিকাল ৫টার পরে মধুমতি নদী পার হই। বাংলাদেশে আসার পরে বর্তমান বৃহত্তর ফরিদপুরের ভাটিয়াপাড়া নামক স্থানে একটি মিনি-ক্যান্টনমেন্ট ছিল, সেখানে প্রায় এক নাগাড়ে ১৫ দিন যাবত গোলাগুলি চলে। ঐ সময়টাতে মুক্তিযোদ্ধাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মরহুম মেজর জেনারেল মোস্তাফিজুর রহমান, মরহুম মেজর নাজমুল হুদা, মরহুম আব্দুল মান্নান মিয়া বীরবিক্রম, হেমায়েত উদ্দীন তালুকদার, ইসমত কাদের গামাসহ আরো অনেকে। ঐ যুদ্ধে বহু মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হলেও পাকবাহিনী যুদ্ধে পরাজিত হয়। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে শীরগ্রাম করিমপুর নামক স্থানে পাকবাহিনীর সাথে সামনাসামনি যুদ্ধ হয় এবং পাকবাহিনীর সকল সদস্য নিহত হয়। ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমি ফরিদপুর মিলিশিয়া ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে যোগদান করি। আমি বঙ্গবন্ধুর একনিষ্ঠ সৈনিক হিসাবে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজও সোনার বাংলা গড়ার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছি।

মোঃ আজিজুল হক (এসএসইউএস)

চেতনায় একাত্তর

আমি মোঃ আজিজুল হক ১৯৫১৩ সালের ৩রা মার্চ পঞ্চগড় জেলার বাহাদুর পাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতা মরহুম জয়নউদ্দীন আহাম্মদ এবং মাতা মোছাঃ আজিজা খাতুন। শৈশবে পিতৃবিয়োগের পর মা ও বড় বোনকে নিয়ে একত্রে সাধারণভাবে জীবনযাপন শুরু করি। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমি কলেজের ২য় বর্ষের ছাত্র ছিলাম। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য আমি পড়ালেখা ছেড়ে প্রয়াত নেতা সাবেক এম,পি মরহুম সিরাজুল ইসলাম সাহেবের নেতৃত্বে তেঁতুলিয়া থানায় কিছুদিন ইয়ুথ ক্যাম্পে অবস্থান করি। পরে সেখান থেকে ভারতের দেরাদুন জেলার টান্ডুয়া সামরিক ঘাঁটিতে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিই। প্রশিক্ষণ শেষে শুধুমাত্র একটা লোহার চাকু সঙ্গে নিয়ে ৬ নং সেক্টরের পঞ্চগড় সদর থানা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করি এবং মুজিব বাহিনীর অধীনে গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি।

গেরিলা যুদ্ধ করতে গিয়ে আমি বিভিন্ন দুঃসাহসিক কাজে অংশ নিই যার মধ্যে ছিল ব্রীজ ভাঙ্গা ও পাকসেনাদের গাড়ি ধ্বংস করা। ২৯ নভেম্বর পঞ্চগড় মুক্ত হবার পর পর্যায়ক্রমে ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুর মুক্ত হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় প্রশাসনের অধীনে গরিনাবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নেই। ১৯৭৭ সালে আমি RDRS এ যোগদান করি। RDRS এ ৩০ বছর চাকুরি শেষ করে ২০০৭ সালে আমি ৫ বছরের জন্য World Food Program (WFP) এর School Feeding Programme-এ যোগদান করি। এরপর আমি **সূচনা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা**, বোদা, পঞ্চগড়-এ সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করি এবং পরপর দুই মেয়াদ সভাপতি ছিলাম।

তারপর ২০১০-২০১২ পর্যন্ত পল্লী বিদ্যুত সমিতির এলাকা পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করি। এরপর আমি আবার **সূচনা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার** সভাপতি হিসাবে যোগ দিয়ে অদ্যাবধি দায়িত্ব পালন করে আসছি। ব্যক্তিগত জীবনে আমি চার সন্তানের জনক। আমার প্রথম সন্তান আতিকা পারভিন (শিলা) বিএসসি পাশ করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছে। দ্বিতীয় সন্তান রাজিউল হাসান আল তারিক (শিশির) শাহাজাহাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিবিএ পাশ করে উচ্চতর পড়াশুনার জন্য জার্মানীতে আছে। ৩য় সন্তান সৌনক ইউনিভার্সিটিতে ও চতুর্থ সন্তান সৌরভ এখন কলেজে পড়ছে। বর্তমানে আমি আমার মা এবং পরিবারকে নিয়ে গ্রামের বাড়ি বাহাদুর পাড়া, পঞ্চগড় সদর থানায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছি।

কিউ.এ.এস.এম. ইয়াকুব (হেল্‌প)

মুক্তিযুদ্ধ আমার জীবন

আমি কিউ.এ.এস.এম. ইয়াকুব ১৯৪৭ সালের ৭ জুলাই মাণিকগঞ্জ জেলার কুমারদহ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করি। আমার পিতা মরহুম এ.টি.এম. আইয়ুব এবং মাতা মনোয়ারা বেগম। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের গণহত্যার সময় আমি ফরিদপুর শহরে ছিলাম। ২৭ মার্চ চট্টগ্রামে অবস্থানকালীন

সেনাবাহিনীর বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ডাক দেন। ফরিদপুরের তৎকালীন জেলা প্রশাসক ঘোষণা করেন যে যাদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে তারা যেন স্থানীয় পুলিশ লাইন থেকে ন্যায্যমূল্যে গুলি কিনে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

আগ্রহী মুক্তিযোদ্ধারা তৎকালীন পুলিশ বাহিনীর কাছ থেকে বুলেট প্রতি ৫ টাকা পরিশোধ করে বুলেট কিনে। এর কিছুদিন পর ১০ আগস্ট স্থানীয় মুক্তিবাহিনী, পাক সেনাক্যাম্পে বিদ্রোহের পরিকল্পনা করে। কিন্তু ক্যাম্প-কমান্ডার (একজন পাকিস্তানী) বিষয়টা আঁচ করে ফেলে। সে তখন রাজাকারসহ ক্যাম্পের সমস্ত বাঙালি সেনাদের একত্রিত করে হাতের অস্ত্র নামাতে বলে, কিন্তু বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনারা আদেশ অমান্য করে যার যার অবস্থানে ফায়ারিং পজিশনে চলে যায়। কিন্তু দুঃখজনকভাবে যে ব্যক্তি প্রথমে অস্ত্র নামাতে অস্বীকার করেছিল তাঁকে ঐ কমান্ডার রিভলভার দিয়ে গুলি করলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে মারা যান। এরপর শুরু হয় পাকিস্তানী-বাঙালিদের (বেঙ্গল রেজিমেন্ট) মধ্য তুমুল যুদ্ধ আর ঐ যুদ্ধে আমিও অংশগ্রহণ করি। ক্যাম্পের বাঙ্কারে অবস্থানরত দু'জন পাকিস্তানী সৈন্য বাঙালিদের পক্ষে যুদ্ধে অংশ নেয়। এটা একটা অভূতপূর্ব ঘটনা ছিল, যা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অন্য কোথাও ঘটেছে বলে জানা যায়নি। এই যুদ্ধে ১০ জন পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হয় আর ৪ জন পালাতে সক্ষম হয়, যাদের একজন আবার পরের দিন মুক্তিবাহিনীর হাতে মারা পড়ে এবং ৩ জন পাকিস্তানী সৈন্য ভয় পেয়ে ক্যাম্পের পাশের খালের পানিতে ঝাঁপ দিলে ডুবে মারা যায়। এই যুদ্ধে বাঙালিদের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাহায্যকারী দুই পাকিস্তানী সৈনিককে পাকিস্তানে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়।

এই ঘটনার পরদিন আমি চলে যাই। আমার মনে হয়েছিল যে অধিক যুদ্ধের কলা-কৌশল জানা দরকার আর সেই কারণেই আমি এক সহপাঠী বন্ধু নিরঞ্জন রায়কে বলে রেখেছিলাম যে, কোন দল ভারতে গেলে আমাকে যেন জানানো হয়। ২৯ সেপ্টেম্বর রাতের বেলায় হঠাৎ নিরঞ্জন এসে জানায় যে একটা দল ভারতে যাচ্ছে, সুতরাং এক্ষুণি যেতে হবে। মাসের শেষ, ঘরে টাকাও ছিল না, মাত্র ৫০ টাকার ১টা নোট, কিছু ভাংতি টাকা আর ছোট বোনের কানের একটা সোনার রিং পায়ের হাঁটুতে বেঁধে মায়ের বিলাপ আর বাবার মৌন সম্মতিকে পুঁজি করে ভারতের পথে রওনা দিলাম। কিছু হেঁটে কিছু নৌকায় এভাবে ভারতের বনগাঁ পৌঁছতে ৮ দিন সময়

লেগেছিল। এখানে মীর আল-আমীন চেঙ্গিসের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। আল-আমীন তখন ক্লাস-নাইনে পড়া ছোট্ট একটি ছেলে, আরও একটা অল্প বয়সের ছেলের (নাম স্মরণে নাই) সাথে পরিচয় হয়। আমরা ৩ জন সবসময় একসাথে থাকতাম। চাকুলিয়াতে আমরা গেরিলা যুদ্ধের বিভিন্ন কৌশলসহ বিভিন্ন অস্ত্র যেমন: ৩০৩ রাইফেল, এস. এল. আর. কারবাইন (স্টেনগান), এল. এম. জি. হ্যান্ড গ্রেনেড, এ্যান্টি আর্মার্ড ভেহিক্যাল মাইন এবং এ্যান্টি ট্যাঙ্ক মাইনের ব্যবহার পদ্ধতির ওপর প্রশিক্ষণ নিই। একদিন প্রশিক্ষণ শেষে কল্যাণী ক্যাম্পে ফিরে এসে দেখি সেখানে নৌবাহিনীতে লোক নিচ্ছে । তখনই আমরা ৩ জন লাইনে দাঁড়াই এবং নির্বাচিত হই। পরে বাসে চেপে মুর্শীদাবাদ জেলার ইতিহাস প্রসিদ্ধ পলাশীর সেই ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত নৌ-কমান্ডো প্রশিক্ষণ শিবিরে চলে আসি। পরের দিন সকালে নাস্তার পরে আমাদের পায়ে ডুবুরিদের ফিন (হাঁসের পায়ের পাতার মত দেখতে) পরিয়ে দিয়ে সাঁতার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তবে সে সাঁতার ছিল চিত-সাঁতার। শুধুমাত্র নাক জাগিয়ে মাথা ও সমস্ত শরীর পানির নীচে রেখে সাঁতার। এছাড়া পেটে বোমা বেঁধে কিভাবে সেটাকে জাহাজ, স্টিমার, লঞ্চ বা গান বোটে লাগিয়ে ধ্বংস করতে হয় প্রশিক্ষণে এটার ওপরে বেশি জোর দেয়া হতো, কারণ ওটাই ছিল নৌ কমান্ডোদের মূল কাজ। এছাড়া কিভাবে কোন অস্ত্র ছাড়াই একজন শত্রুকে ঘায়েল অথবা বন্দি করা যায় এ বিষয়ে মোট ২২৫টি কৌশল বা মারপ্যাঁচ শেখানো হয়।

নৌ-কমান্ডোদের সরাসরি লক্ষ্যস্থল এবং লক্ষ্যবস্তু ঠিক করে মোটামুটি ৫-১০ জনের এক একটা দল গঠন করে তার প্রতিটা দলের একজন দলনেতা স্থির করে দিয়ে দেশের ভেতর পাঠানো হতো। যুদ্ধ করার তেমন কোন প্রয়োজনীয়তা না থাকায় শুধুমাত্র আত্মরক্ষার জন্য দলনেতার হাতে একটি পিস্তল/রিভলভার বা একটি কার্বাইন (স্টেনগান) দেয়া হত। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দরসহ দেশের বিভিন্ন নদী বন্দরে অপারেশন করে বহু সমুদ্রগামী জাহাজ, ফেরী ও লঞ্চ ধ্বংস করা হয়ছে। নৌ-কমান্ডোদের জন্য একটা বিশেষ আইন ছিল সেটা হচ্ছে প্রত্যেক অপারেশন শেষে পুনরায় পলাশী ক্যাম্পে অবশ্যই ফিরে আসতে হবে। দেশ যখন স্বাধীন হয় ঠিক সেই মুহূর্তে আমি পলাশী ক্যাম্পেই অবস্থান করছিলাম। একদিন ক্যাম্প প্রধান লেঃ কমান্ডার জেমস মার্টিজ সবাইকে ডেকে জানালেন যে, দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমরা সবাই খুশীতে আকাশের দিকে তাকিয়ে শুকরিয়া জানাই। পরের দিন একটি বিশেষ ট্রেনে প্রথমে কোলকাতা ও পরে দেশে ফিরে আসি। দেশে ফিরে আমি পড়াশোনা শুরু করি এবং বিএসসি এবং পরে ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করি। এরপর প্রথমে একটি ফার্মে এবং পরে জাতিসংঘের শিশু তহবিল (ইউনিসেফ-এর) এর পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন বিভাগের গবেষণা উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ শাখার প্রকল্প কর্মকর্তা হিসাবে ২০ বছর এবং পরামর্শক হিসাবে আরও ১০ বছর কাজ করেছি। বর্তমানে আমি অবসর জীবন যাপন করছি। আমার ছেলে ফুয়াদ ইয়াকুব কাজী সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর শেষ পর্বে আর মেয়ে তাসমিয়া ইয়াকুব কাজী এ-লেভেল শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রস্তুতি নিচ্ছে।

বিশেষ ক্রোড়পত্র

সমাজ উন্নয়নে অবদানের জন্য
বিশেষ সম্মাননা প্রদান

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব ছিল ব্যতিক্রমী চরিত্রের। এই পর্বে দু'জন কৃতী ব্যক্তিকে তাদের বিশেষ ভূমিকা পালনের জন্য স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। এঁদের একজন আমাদের স্বদেশী জামিল চৌধুরী, যিনি ভাগ্যহত কিশোরী উন্নয়নে দৃষ্টান্তমূলক কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। অন্যজন একজন ভিয়েত নামী নাগরিক। তিনি পিকেএসএফ-এর কাঁকড়া উন্নয়ন প্রকল্পে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করে আমাদের দেশীয় অর্থনীতির বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন।

অনুষ্ঠানের এই পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়-এর ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব জনাব মোঃ ইউনুসুর রহমান। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। পিকেএসএফ-এর পর্ষদ সভার সদস্যবৃন্দ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ, পিকেএসএফ-এর অন্যান্য কর্মকর্তা এবং পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি এই পর্বের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

স্বাগত বক্তব্য
জনাব মোঃ আবদুল করিম
ব্যবস্থাপনা পরিলচালক, পিকেএসএফ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের মাননীয় সচিব, পিকেএসএফ-এর পর্ষদ সভার সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ, সম্মাননাপ্রাপ্ত সহযোগী সংস্থার প্রধান নির্বাহী ও সভাপতিবৃন্দসহ উপস্থিত অতিথিবৃন্দকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি দ্বিতীয় অধিবেশনে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। বক্তব্যের শুরুতেই তিনি বলেন, অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সহযোগী সংস্থার প্রধান নির্বাহী ও সভাপতিগণকে সম্মাননা প্রদান করতে পেরে পিকেএসএফ গৌরবান্বিত ও সম্মানিত বোধ করছে। তিনি বলেন, সুদীর্ঘ ২৬ বছর যাবত পিকেএসএফ দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করছে। বাংলাদেশ সরকারের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে অর্থনৈতিক ও জাতীয় উন্নয়নে যে গতিশীল এবং ইতিবাচক ধারা সৃষ্টি হয়েছে তা সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা করেছে। এক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে প্রদত্ত আর্থিক ও কারিগরি সেবা সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে স্বল্প পরিসরে হলেও ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। সরকারের অব্যাহত সহযোগিতার মাধ্যমে দেশের গ্রামীণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিশীল ধারা সৃষ্টিতে পিকেএসএফ ভূমিকার কথা তিনি উল্লেখ করেন। এমন সুযোগ সৃষ্টিতে পিকেএসএফ-কে সহায়তা করায় তিনি মাননীয় অর্থমন্ত্রী ও সরকারকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

তিনি বলেন, পর্ষদ সভাপতির গতিশীল নেতৃত্বে বর্তমানে পিকেএসএফ ২০০টি সহযোগী সংস্থার সাত হাজারের বেশি শাখার মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি আরো বলেন, ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও কালক্রমে পিকেএসএফ বহুমুখী উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ জন্যে টেকসইভাবে দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার আলোকে মানব ও পরিবারকেন্দ্রিক উন্নয়নের ধারাকে সমুন্নত রেখে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি পরিচালনা করছে। জনগণের সকল চাহিদা, প্রয়োজন এবং মূল্যবোধ বিকাশের নিরিখে পিকেএসএফ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতিসহ নানাবিধ ইস্যু নিয়ে কাজ করে দেশের টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

পিকেএসএফ কর্তৃক গৃহীত বহুমুখী কর্মকাণ্ড সফলভাবে বাস্তবায়ন এবং মাঠ পর্যায়ের চাহিদা পূরণে অর্থের প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। এজন্য তিনি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সুদৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সরকারের নিকট হতে চাহিদামাফিক আর্থিক সহযোগিতা পেলে সহযোগী সংস্থার মাঠপর্যায়ের অব্যাহত তহবিল চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এছাড়া টেকসইভাবে দারিদ্র্য নিরসনে পিকেএসএফ কর্তৃক গৃহীত বহুমুখী পদক্ষেপসমূহ সফলভাবে বাস্তবায়ন করার পথ সুগম হবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিশেষ সম্মাননা প্রাপ্ত মিজ পাম থি হং - এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মাননা প্রাপ্ত ভিয়েতনাম-এর নাগরিক মিজ পাম থি হং ১৭ বছর ধরে নিজ দেশ ও দেশের বাইরে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে উন্নয়ন খাতে কাজ করে যাচ্ছেন। ভিয়েতনাম হতে পিকেএসএফ তথা বাংলাদেশে প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে কাঁকড়া হ্যাচারী স্থাপন করার ক্ষেত্রে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন। মিজ পাম থি হং ১৯৯২ সালে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ-এ স্নাতক, ১৯৯৫ সালে বিজনেস স্টাডিজ-এ স্নাতক এবং ২০১২ সালে পাবলিক হেলথ-এর ওপর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ইউএসএআইডি, কোহেড, আইরিশ এইড, ইউএনডিপি, ইউনিসেফ, হেল্‌থ রাইট-এর মত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া, তিনি এডিবি, আইরিশ এইড, কোহেড, এইচআরআই এবং অক্সফাম-এর বিভিন্ন গবেষণা ও জরিপ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত ছিলেন। উন্নয়ন খাতে দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় তিনি দরিদ্র ও দুর্বল মানুষের কাছে জ্ঞান ও প্রযুক্তি ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে নিজস্ব পদ্ধতি তৈরি করেছেন।

ভিয়েতনামের স্থানীয় বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবা, জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবেলা, জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারী ও শিশুদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, কৃষি ও মৎস্য চাষ সম্পর্কিত প্রযুক্তি ও জ্ঞান সম্প্রসারণ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী ও শিশুদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে কাজসহ নানামুখী জনহিতকর কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হয়েছেন। বর্তমানে তিনি সেন্টার ফর এডুকেশন এ্যান্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (সিইসিডি), ভিয়েতনাম-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে কাজ করছেন। সিইসিডি ভিয়েতনাম-এর Education Psychological Science Association-এর অধীনস্থ একটি প্রতিষ্ঠান। এর আগে তিনি 'সেন্টার ফর কমিউনিটি হেল্‌থ এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (কোহেড)', 'হেল্‌থ রাইট ইন্টারন্যাশনাল', 'সেইভ দ্য চিলড্রেন ইউকে', 'অক্সফাম', 'এসএনভি-নেদারল্যান্ডস্ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন', 'ক্লিন্টন ফাউন্ডেশন' ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। মিজ পাম থি হং-কে ভিয়েতনামী উন্নত কাঁকড়া উৎপাদন প্রযুক্তি পিকেএসএফ তথা বাংলাদেশে হস্তান্তরে বিশেষ ভূমিকা পালনের জন্য এবং বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে অবদান রাখার জন্য পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর পক্ষ থেকে সম্মাননা জানানো হয়।

বিশেষ সম্মাননা প্রাপ্ত জনাব জামিল চৌধুরীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

পিকেএসএফ-এর পক্ষ থেকে দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব সক্ষমতা উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য আজীবন সম্মাননা প্রাপ্ত বাংলাদেশ ফিমেইল একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা জনাব জামিল চৌধুরী ১৯৫০ সালের ৩০ মে সুনামগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দিরাই হাইস্কুল হতে শিক্ষাজীবন আরম্ভ করে লন্ডনের গ্রীনিচ ইউনিভার্সিটি হতে ইংরেজিতে ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেন।

বাংলাদেশ ফিমেইল একাডেমীর পাশাপাশি তিনি 'গ্রামীণ জনকল্যাণ সংসদ (জিজেকেএস)'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক। তিনি ১৯৮০ সালে দেশে প্রথমবারের মত এতিম মেয়েদের জন্য বিনামূল্যে লেখাপড়া, খাদ্য ও আবাস নিশ্চিতকরণসহ সমাজে তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় একটি কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি সুনামগঞ্জের দিরাই-এ বাংলাদেশ ফিমেইল একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন।

বাংলাদেশ ফিমেইল একাডেমী ও জিজেকেএস-এর দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি কনজ্যুমার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) ও প্রবাসী সার্ভিস সেল-এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় তাঁর নানামুখী উদ্যোগের মধ্যে দরিদ্র মানুষের জন্য বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা, এতিম মেয়েদের জন্য বিনামূল্যে লেখাপড়া, খাদ্য ও আবাস নিশ্চিতকরণ, পরিবার পরিকল্পনা, বিধবা মহিলাদের কল্যাণে প্রশিক্ষণ প্রদান, দেশে-বিদেশে বিভিন্ন দুর্যোগে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন উল্লেখযোগ্য। জনাব জামিল চৌধুরী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব প্রদান ও

প্রশংসনীয় অবদানের জন্য বিভিন্ন সময়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে পুরস্কৃত হন। ১৯৯৭ সালে পরিবেশ রক্ষার্থে নিজ হাতে ১,৫০,০০০ বৃক্ষরোপণ করে তিনি প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে জাতীয় পুরস্কার অর্জন করেন। ২০০০ সালে মানবাধিকারের জন্য আর্জেন্টিনার বুয়েন্স আয়ারস হতে সনদ, ২০০২ সালে সমাজ সেবায় অবদান রাখায় যুক্তরাজ্যের বার্মিংহামে লর্ড মেয়রের কাছ থেকে সনদ এবং ২০০৩ সালে প্রবাসীদের অধিকার নিয়ে কাজের অবদান হিসেবে লণ্ডন মেয়রের কাছ থেকে সনদ লাভ করেন। সর্বশেষ তিনি ২০১৩ সালে সমাজসেবায় অবদানের জন্য জাতীয়ভাবে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা স্বর্ণপদক লাভ করেন।

দারিদ্র্য বিমোচন তথা টেকসই উন্নয়ন এবং মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় জীবনব্যাপী বিভিন্নভাবে গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডে অবদান রাখার জন্য জনাব জামিল চৌধুরীকে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর পক্ষ থেকে সম্মাননা জানানো হয়।

বিশেষ সম্মাননা প্রাপ্তদের অনুভূতি প্রকাশ

মিজ পাম থি হং

মিজ পাম থি হং তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, পিকেএসএফ থেকে এভাবে সম্মাননা পেয়ে তিনি অভিভূত ও উচ্ছ্বসিত। তিনি বলেন, ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা প্রায় অভিন্ন। উন্নত কাঁকড়া উৎপাদন প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে পারস্পরিক আরো নিবিড় সম্পর্কোন্নয়ন করে ভবিষ্যতে একত্রে কাজ করার লক্ষ্যে তিনি অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

পরিশেষে তিনি বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় (ধন ধান্য পুষ্পে ভরা) দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করে। তিনি পিকেএসএফ এবং বাংলাদেশের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

জনাব জামিল চৌধুরী

বাংলাদেশ ফিল্মেল একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা জনাব জামিল চৌধুরী অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, আমার মনে হয় প্রত্যাশিত কাজের মাত্র দশ শতাংশ আমি করতে পেরেছি। পুরোপুরি করতে না পারায় পূর্ণাঙ্গ আত্মতৃপ্তি পাইনি। বিভিন্ন সময়ে সরকারের সহযোগিতা তাঁকে এ কাজে উৎসাহ যুগিয়েছে বলে তিনি সরকারের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পিকেএসএফ-এর অব্যাহত সহযোগিতা তাঁকে এই কাজে বিশেষভাবে উৎসাহ যুগিয়েছে এবং অনুপ্রাণিত করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। পিকেএসএফ থেকে তাঁর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ বিশেষ সম্মাননা প্রদান করায় তিনি পিকেএসএফ-এর প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, প্রবাসীদের মধ্যে অনেকে দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে চায়। তাই তাঁদেরকে তিনি অভুক্ত প্রতিবেশী, এতিম ও অসহায় শিশু বিশেষ করে মেয়েশিশুদের পুনর্বাসন ও কল্যাণে এগিয়ে আসার জন্যে বিশেষভাবে আহ্বান জানান। এছাড়াও যাদের খালি বাড়ি বা জমি পড়ে আছে তাঁদেরকে মেয়েশিশুদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে অবহেলিত মেয়েশিশুদের পুনর্বাসন ও উন্নয়নে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, অভিভাবকহীন মেয়েশিশু বিশেষত যারা বাসাবাড়িতে গৃহ পরিচারিকার কাজ করে তারা পরিবারের জন্যে ঝুঁকিপূর্ণ। এ জন্যে তিনি অর্থমন্ত্রীর মাধ্যমে সরকারকে ছয় বছরের মেয়ে শিশুকে মূলস্রোত ধারায় নিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি দেশে বিরাজমান জঙ্গীবাদ নিরসনের মাধ্যমে গ্রামসহ সামগ্রিক উন্নয়নে সকলকে এগিয়ে আসার জন্যে বিনীতভাবে অনুরোধ করেন। সবাই মিলে কাজ করতে পারলে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা সম্ভব বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য

জনাব মোঃ ইউনুসুর রহমান, সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান করার লক্ষ্যে আয়োজিত এ মহতী সভায় উপস্থিত হতে পেরে তিনি

আনন্দিত ও গর্বিত। তিনি সম্মাননাপ্রাপ্ত সকল মুক্তিযোদ্ধাকে শ্রদ্ধার সাথে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এ ধরনের একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করায় তিনি পিকেএসএফ-কেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

তিনি বলেন, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের অব্যবহিত পরের এবং স্বাধীনতা পরবর্তী আজকের বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির ক্রমবিবর্তনই বলে দেয় বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক। তারপরেও আর্থিক সেবার ক্ষেত্রে চাহিদা ও সরবরাহের মাঝে এখনও ফারাক রয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রাষ্ট্রায়ত্ত ও বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সুদের হার কম এবং তারল্য বেশি থাকা সত্ত্বেও ব্যাংকগুলো চাহিদা নিরিখে ঋণ দিতে পারছে না। অন্যদিকে, ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের সুদের হার বেশি হলেও তারা তুলনামূলকভাবে বেশি পরিমাণে ঋণ বিতরণ করছে। ফলে দেশে ক্ষুদ্রঋণের ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনের তুলনায় ঋণ সরবরাহ করতে পারছে না। সর্বমোট চাহিদার মাত্র ৪৫ শতাংশ যোগান দেয়া সম্ভব হলেও ৫৫ শতাংশ চাহিদা এখনও পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। বিদ্যমান বাস্তবতায় ক্ষুদ্রঋণের প্রসারে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় করে চাহিদা মাফিক আর্থিক সেবা সরবরাহ করার প্রয়োজন রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের ভাববার অবকাশ রয়েছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, দারিদ্র্য নিরসনে ভূমিকা রাখায় এবং ভালো কাজ করায় পিকেএসএফ-এর অবদান ও সুনাম দেশ ও বহির্বিশ্বে আজ স্বীকৃতি অর্জন করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, বহুমাত্রিক দারিদ্র্য নিরসনে নতুন নতুন উদ্যোগ নিয়ে টেকসইভাবে দারিদ্র্য নিরসনে সরকারের শীর্ষস্থানীয় আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পিকেএসএফ ভবিষ্যতে এগিয়ে যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সভাপতির বক্তব্য

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অভিবাদনসহ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে পিকেএসএফ কি আঙ্গিকে কর্মসূচি সাজানোর পরিকল্পনা করছে সে সম্পর্কে তিনি আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, রাষ্ট্রীয় নীতি ও কাঠামো, টেকসই উন্নয়ন ও মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো-এ চারটি

বিষয়কে সামনে রেখে পিকেএসএফ তার আগামী কর্মসূচি সাজানোর পরিকল্পনা করছে। তিনি এই চারটি আঙ্গিককে শুধু মুখে নয় অন্তরে ধারণ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন, পিকেএসএফ-এর সংঘবিধিতে বর্ণিত বিষয় ধারণ করে বর্তমানে পিকেএসএফ এগিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, মানব সক্ষমতা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও অর্থায়ন-এই সব ইস্যুতে কাজের ধরন নির্ধারণ করে পিকেএসএফ

নিজস্ব কর্মসূচি ঢেলে সাজিয়ে তা বাস্তবায়নে পরিকল্পনামাফিক অগ্রসর হচ্ছে। উক্ত পরিকল্পনার আওতায় ইতোমধ্যে অনেকগুলো কাজ করা হয়েছে এবং অনেকগুলো সামাজিক ইস্যুতে ভবিষ্যতে পিকেএসএফ কাজ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পূর্বে একমুখী নীতি অনুসরণ করলেও বর্তমানে পিকেএসএফ বহুমুখী নীতি অনুসরণে মনোনিবেশ করছে। ক্ষুদ্র পরিমাণ অর্থ বিতরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে চাহিদামাফিক আর্থিক পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা করছে। এছাড়াও আর্থিক সেবার সাথে প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও বাজারজাতকরণের সেবা দেয়া হচ্ছে।

মানুষের পরিবর্তিত জীবন ও সমাজ কাঠামো এবং দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতায় কাউকে বাদ দিয়ে নয় বরং সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে পরিবারভিত্তিক পরিকল্পনা উন্নয়নের লক্ষ্যে মানব সক্ষমতা ও জীবনমানের উন্নয়নে **সমৃদ্ধি** কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, পিকেএসএফ এখন ক্ষুদ্রঋণ থেকে বেরিয়ে এসে উদ্যোক্তা তৈরির দিকে বেশি মনোযোগী হচ্ছে। উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রযুক্তি বিষয়েও জ্ঞান দেয়া হয়েছে। উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও উদ্যোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রউদ্যোক্তা তৈরি এবং ক্ষুদ্রউদ্যোগ সৃষ্টির ধারাবাহিকতায় সারা দেশব্যাপী গুচ্ছাকারে উদ্যোক্তা শনাক্ত করে আর্থিক, কারিগরি ও বাজারজাতকরণ সেবা সমন্বিতভাবে সরবরাহ করা হচ্ছে। কৃষিজাত দ্রব্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষি উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট কৃষিবিষয়ক বিভিন্ন প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে কৃষি বিপ্লব ঘটাতেও পিকেএসএফ সহায়কের ভূমিকা পালন করছে। সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে বিদ্যমান অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে তাঁদের জন্য সহায়ক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সার্বিকভাবে পিকেএসএফ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচি গ্রহণ করে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করছে।

তাঁর বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে বাংলাদেশের প্রথিতযশা গবেষক, শিক্ষক, অর্থনীতিবিদ, সমাজ বিশ্লেষক, কুটনৈতিক এবং উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের সংকলনে শিক্ষা, প্রশাসন, জ্ঞান ও অর্থনীতি, ব্যাংকিং, নারী উন্নয়ন, গ্রামীণ উন্নয়ন, নিরীক্ষা ইত্যাদি ইস্যু নিয়ে Bangladesh's Development: Some Issues and Perspectives শিরোনামে লিখিত বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। গ্রন্থটি মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিতের সম্মানে মূল্যবান একটি প্রবন্ধ সংকলন। এটির সম্পাদনা করেছেন কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ও শফি আহমেদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্য

জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত

মাননীয় অর্থমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাননীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই গ্রামীণ ব্যাংক ও পিকেএসএফ সৃষ্টির ইতিহাস সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ১৯৮২ সালে গবেষণামূলক প্রকল্প সমাপ্তির পরে ১৯৮৩ সালে উক্ত প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্রঋণের ধারণা নিয়ে আসেন ড. মুহম্মদ ইউনূস, যে ধারণা থেকে গ্রামীণ ব্যাংকের উৎপত্তি হয়। প্রথম তিন বছর গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প হিসেবে পরিচালিত হয়। পরে আইন (অধ্যাদেশ) জারি করে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। সরকারের অর্থ সহায়তায় গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয় বিধায় এটি সরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান। গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় বিশ্বব্যাংকের কোন অবদান নেই। গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠাকালে দেশের সব ব্যাংকাররা এর বিরোধিতা করে বলেছিলেন, ড. মুহম্মদ ইউনূস ঋণ নিয়ে প্রকল্প চালাচ্ছেন। তারা বলেন, মানুষের প্রয়োজনে ব্যাংক হতে আরও ঋণ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু গ্রামীণ ব্যাংকের মাধমে ঋণ বিতরণ অর্থনৈতিক কার্যক্রম হিসাবে যৌক্তিক নয়। বিদেশী দাতা সংস্থা হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংককে প্রথম ঋণ দেয় ইফাদ।

পরবর্তী কালে গ্রামীণ ব্যাংকের মতো আরও একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে সরকারের ৫-৭ বছর যাবত আলোচনা চলে, কিন্তু আলোচনা ব্যর্থ হয়। এরপরেই সরকারি অর্থায়নে পিকেএসএফ সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন, পিকেএসএফ ক্ষুদ্রঋণের ক্ষেত্রে একেবারেই বাংলাদেশের নিজস্ব ধ্যান-ধারণায় সৃষ্ট একটি দেশীয় প্রতিষ্ঠান। কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর হতে ৪-৫ বছর সরকারের অর্থায়নেই পিকেএসএফ পরিচালিত হয়। নিজস্ব চিন্তা ও উদ্যোগ সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেকসই দারিদ্র্য নিরসনে পিকেএসএফ তার অভাবনীয় সাফল্যের ধারা অব্যাহত রেখেছে।

বাংলাদেশ বিনির্মাণের ভবিষ্যত পরিকল্পনার বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদসহ তিনি রূপকল্প-২০২১ প্রণয়ন করেন। পরবর্তী কালে ১৬ পৃষ্ঠার নির্বাচনী ইশতেহার হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তা ১২ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে জনসম্মুখে উপস্থাপন করেন। আগামী ২০৪১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ কিরূপ হতে পারে তার রূপরেখা ও পরিকল্পনা বর্তমানে প্রণয়ন করা হচ্ছে বলে তিনি সকলকে অবহিত করেন।

উন্নয়নের ধারাবাহিকতার ফলে বাংলাদেশে এখন অগ্রগতির যে গতিশীল ধারা তৈরি হয়েছে তাতে আর পিছনে ফিরে তাকানোর কোন সুযোগ নেই। উন্নয়নের বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে বলে তিনি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ইদানিং শান্তির বিরুদ্ধে আক্রমণ হচ্ছে, যা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রা ও স্থিতিশীলতার জন্যে শুভকর নয় বলে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জঙ্গীবাদ মোকাবিলায় সরকার কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে বলে তিনি এই সভায় সকলকে অবহিত করেন।

সুদীর্ঘ ৬৫ বছরের বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তিনি জনসেবায় নিয়োজিত ছিলেন বলে মন্তব্য করেন। তিনি বাংলাদেশের উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট নানাবিধ কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত থেকে অবদান রাখার কথা স্মরণ করেন। বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহতভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তিনি সন্দেহাতীতভাবে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সম্প্রসারণ ও জঙ্গীবাদ নির্মূলে সংশ্লিষ্ট সকলকে এক হয়ে কাজ করার জন্যে তিনি আহ্বান জানান।

তাঁর সম্মানে প্রকাশিত প্রবন্ধ সংকলনের মোড়ক উন্মোচনে তিনি তাঁর উচ্ছ্বসিত অনুভূতি ব্যক্ত করেন এবং গ্রন্থটির সম্পাদকদ্বয় ও প্রাবন্ধিকদের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সেমিনারের বিষয়ে দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবেদন

ঢাকা, ২৮ জুলাই ২০১৬, ১৩ শ্রাবণ ১৪২৩, ২২ শাওয়াল ১৪৩৭ বৃহস্পতিবার রেজি. নং ডিএ ১৮৮০, বর্ষ ১৮, সংখ্যা ২৬০, দাম ১৫ টাকা

প্রথম আলো

‘পিসের বিরুদ্ধে আক্রমণ আসছে’ : অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেছেন, ‘ইসলামিং পিসের (শান্তি) বিরুদ্ধে আক্রমণ আসছে। সেটা মোকাবিলা করাই এখন প্রধান কাজ। এ বিষয়ে আমরা এখন কঠোর হচ্ছি। আজকের পত্রিকায় আপনারা সেটা দেখেছেন। কিছুদিন আগে গুলশানের ঘটনায়ও দেখেছেন।’

গতকাল বুধবার পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) এক অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় সাম্প্রতিক জঙ্গি হামলার বিষয়ে এ কথা বলেন। আগারগাঁওয়ের পিকেএসএফ মিলনায়তনে ‘উন্নয়নে পিকেএসএফ’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থমন্ত্রী। পিকেএসএফের চেয়ারম্যান কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এতে সভাপতিত্ব করেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখার জন্য বাংলাদেশ ফিল্মেল একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা জামিলুর রেজা চৌধুরীকে আজীবন সম্মাননা দেওয়া হয়। এ ছাড়া পিকেএসএফের মাধ্যমে ভিয়েতনাম থেকে বাংলাদেশে কাঁকড়া হ্যাচারি প্রযুক্তি স্থানান্তরের জন্য ভিয়েতনামের নাগরিক পাম থি হংকে বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয়।

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত আরও বলেন, ক্ষুদ্রঋণের ক্ষেত্রে পিকেএসএফ এ দেশের নিজস্ব সৃষ্টি। এ সময় তিনি পিকেএসএফ সৃষ্টির ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, ‘প্রথমে গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প হিসেবে তিন বছর পরিচালিত হয়। পরে আইন (অধ্যাদেশ) করে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটি সম্পূর্ণ সরকারি প্রতিষ্ঠান। যখন গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়, তখন দেশের সব ব্যাংকার এর বিরোধিতা করেছিলেন। সে সময় তাঁরা বলেছিলেন, ইউনূস সাহেবকে (ড. মুহাম্মদ ইউনূস) আমরা তো ঋণ দিচ্ছি। প্রয়োজনে আরও ঋণ দেব, যাতে তিনি (ড. মুহাম্মদ ইউনূস) আরও প্রকল্প পরিচালনা করতে পারেন। কিন্তু সরকার অর্থ দিয়ে গ্রামীণ ব্যাংক তৈরি করেছে।’

অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় বিশ্বব্যাংকের কোনো অবদান নেই। বিদেশি দাতা সংস্থা হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংককে প্রথম ঋণ দেয় ইফাদ। পরে গ্রামীণ ব্যাংকের মতো আরেকটি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে পাঁচ-সাত বছর আলোচনা চলে। কিন্তু আলোচনা ব্যর্থ হয়। এরপর সরকারি অর্থায়নে পিকেএসএফ সৃষ্টি হয়।

অর্থমন্ত্রীর মতে, বাংলাদেশে এখন অগ্রগতির যে গতিশীলতা তৈরি হয়েছে, তাতে আর পিছিয়ে পড়ার সুযোগ নেই।

ওই অনুষ্ঠানে কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, পিকেএসএফ এখন ক্ষুদ্রঋণ থেকে বেরিয়ে এসে উদ্যোক্তা তৈরির দিকে বেশি মনোযোগী হচ্ছে। উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রযুক্তি বিষয়ে জ্ঞান দেওয়া হচ্ছে।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব ইউনুসুর রহমান বলেন, ক্ষুদ্রঋণে সুদের হার ২৫ শতাংশ হয়। অন্যদিকে ব্যাংকে উদ্বৃত্ত তারল্য আছে। ক্ষুদ্রঋণ প্রসারে এ দুটির মধ্যে সমন্বয় করার চেষ্টা হচ্ছে। তিনি মনে করেন, দেশে এখন যে পরিমাণ ক্ষুদ্রঋণের চাহিদা আছে, এর মাত্র ৪৫ শতাংশের মতো দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন পিকেএসএফের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুল করিম। অনুষ্ঠানে ক্ষুদ্রঋণবিষয়ক ‘ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ : সাম ইস্যুজ অ্যান্ড প্রসপেক্টিভস’ নামে একটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। বইটি সম্পাদনা করেছেন পিকেএসএফের চেয়ারম্যান কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ।

এর আগে সকালে পিকেএসএফের সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও নির্বাহী পরিচালকদের মধ্যে যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছেন, তাঁদের সম্মাননা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে ১৮টি সহযোগী প্রতিষ্ঠানের ২২ জনকে এ সম্মাননা ক্রেস্ট হিসেবে ক্রেস্ট দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার মো. ফজলে রাব্বি মিয়া।

জামিলুর রেজা চৌধুরী ও ভিয়েতনামের নাগরিক পাম থি হংকে আজীবন সম্মাননা দিল পিকেএসএফ

দৈনিক
জনকণ্ঠ

ঢাকা ॥ বৃহস্পতিবার, ১৩ শ্রাবণ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ, ২৮ জুলাই ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, যাবে- কোন অবস্থাতেই পেছনে ফেরানো যাবে না

'উন্নয়নে পিকেএসএফ' অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী মুহিত

স্টাফ রিপোর্টার ॥ অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেছেন, সুখী, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ দেখা তার আজীবনের স্বপ্ন। কিন্তু সেই শান্তির ওপর এই মুহূর্তে আক্রমণ আসছে। এটা মোকাবেলা করাই এখন সবচেয়ে বড় কাজ। শান্তিভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে সরকারের অবস্থান যে সুদৃঢ়- কল্যাণপুরে অভিযানের মাধ্যমে ইতিমধ্যে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, যাবে। কোন অবস্থাতেই এই দেশকে আর পেছনে ফেরানো যাবে না।

বুধবার বিকেলে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ভবনের অডিটোরিয়ামে 'উন্নয়নে পিকেএসএফ-২০১৬' শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। দারিদ্র্যবিমোচন তথা টেকসই উন্নয়ন এবং সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন এমন ব্যক্তিদের সম্মাননা প্রদানের জন্য পিকেএসএফ এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে দুই পর্বে মোট ২৪ জনকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। প্রথম পর্বে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য পিকেএসএফের সহযোগী সংস্থার ২২ শীর্ষ কর্মকর্তা, যারা মুক্তিযুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছেন তাদের সম্মাননা দেয়া হয়। দ্বিতীয় পর্বে অসহায় মেয়ে শিশুদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অবদানের জন্য বাংলাদেশ ফিমেল একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা জামিল চৌধুরী এবং বাংলাদেশে কাঁকড়া হ্যাচারি প্রযুক্তি স্থানান্তরের জন্য ভিয়েতনামের নাগরিক পাম থি হংকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় পর্বের প্রধান অতিথি অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এ দুজনের হাতে সম্মাননা তুলে দেন। সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফের সভাপতি ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব মোঃ ইউনুসুর রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মুখ্যসচিব ও পিকেএসএফের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আবদুল করিম।

অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী বলেন, পিকেএসএফ এবং গ্রামীণ ব্যাংক বাংলাদেশের নিজস্ব ও একক চিন্তার সৃষ্টি। এ দুটো প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি ও দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে বিদেশী দাতা প্রতিষ্ঠানের কোন অবদান নাই। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে পিকেএসএফের কার্যক্রম শুরু থেকেই মানানসই ছিল, যে কারণে এটি সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। তিনি বলেন, কর্ম যদি থাকে তবে আয় হয়। এই কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিই হলো মূল ব্যাপার। ২০৪১ সালে বাংলাদেশ উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে- এই আশাবাদ দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করে মন্ত্রী বলেন, জীবনের শেষ ধাপ অতিক্রম করছি। আমি নিশ্চিতভাবেই দেখে যেতে পারব না। তবে আমাদের বর্তমান তরুণ প্রজন্ম দেখবে, ২০৪১ সালের বাংলাদেশ নিয়ে আমরা যে স্বপ্ন দেখেছি ও পরিকল্পনা করেছি তা সঠিক। সভাপতির বক্তব্যে পিকেএসএফ সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমেদ বলেন, ক্ষুদ্র ঋণের বৈচিত্র্যায়ন ও বহুমুখীকরণ করছে পিকেএসএফ।

বৃহস্পতিবার
২৮ জুলাই ২০১৬ ১৩ শ্রাবণ ১৪২৩
সমকাল

জঙ্গিবাদ রুখে দেওয়ার সময় এখনই : অর্থমন্ত্রী

বিশেষ প্রতিনিধি

জঙ্গিবাদ মোকাবেলায় সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেছেন, সুখী-সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় দেশ যখন এগিয়ে যাচ্ছে, তখন জঙ্গি হামলায় অগ্রগতি বিনষ্ট করা হচ্ছে। এই অগ্রযাত্রা ধরে রাখতে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর উপযুক্ত সময় এখনই। গ্রামীণ ব্যাংক সম্পূর্ণ সরকারি ব্যাংক বলে দাবি করেন তিনি। গতকাল বুধবার বিকেলে আগারগাঁওয়ে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন অর্থমন্ত্রী। পিকেএসএফ মিলনায়তনে 'উন্নয়নে পিকেএসএফ-২০১৬' শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থমন্ত্রী। পিকেএসএফের চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এতে সভাপতিত্ব করেন।

অর্থমন্ত্রী বলেন, ইদানীং শ্রান্তির বিরুদ্ধে আক্রমণ আসছে। সেটা আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবেলা করেছি। কল্যাণপুরের ঘটনায় পত্রিকায় আপনারা সেটা দেখেছেন। কিছুদিন আগে গুলশানের ঘটনায়ও দেখেছেন। গুলশানের জঙ্গি হামলা সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবেলা করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের উন্নয়নে বিশেষ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

জঙ্গিবাদ রুখে

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

অবদান রাখার জন্য বাংলাদেশ ফিল্মেল একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা জামিলুর রেজা চৌধুরীকে আজীবন সম্মাননা দেওয়া হয়। এ ছাড়া পিকেএসএফের মাধ্যমে ভিয়েতনাম থেকে বাংলাদেশে কাঁকড়ার হ্যাচারি প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য ভিয়েতনামের নাগরিক পাম থি হং-কে বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয়।

অর্থমন্ত্রী বলেন, ক্ষুদ্রঋণের ক্ষেত্রে পিকেএসএফ এই দেশের নিজস্ব সৃষ্টি। এ সময় তিনি পিকেএসএফ সৃষ্টির ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, সরকারি অর্থায়নে পিকেএসএফ সৃষ্টি হয়। মুহিত মনে করেন, বাংলাদেশে এখন অগ্রগতির যে গতিশীলতা তৈরি হয়েছে, তাতে আর পিছিয়ে পড়ার সুযোগ নেই।

পিকেএসএফের চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান বলেন, ক্ষুদ্রঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। বর্তমান নীতি অনুযায়ী, উপযুক্ত ব্যক্তিকে অর্থায়ন করা হচ্ছে। তার সঙ্গে প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি সহায়তা ও বিপণন ব্যবস্থায় সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এসব পদক্ষেপের ফলে ক্ষুদ্রঋণের সাফল্য এসেছে।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব ইউনুসুর রহমান বলেন, ক্ষুদ্রঋণের সুদহার অত্যন্ত বেশি। এটা এখন ২৫ শতাংশ। উচ্চ হারে সুদ নেওয়ার পরও ক্ষুদ্রঋণের চাহিদা রয়েছে। অন্যদিকে, ব্যাংকে সুদহার ক্ষুদ্রঋণের চেয়ে অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও উদ্বৃত্ত তারল্য রয়েছে। তিনি মনে করেন, ক্ষুদ্রঋণ বিতরণে সুদহার নির্ধারণ নিয়ে সমন্বয় থাকা উচিত।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুল করিম। অনুষ্ঠানে ক্ষুদ্রঋণ বিষয়ক 'ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ : সাম ইস্যুস অ্যান্ড প্রসপেক্টটিভস' নামে একটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। বইটি সম্পাদনা করেছেন পিকেএসএফের চেয়ারম্যান কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ও শফিক আহমেদ। এর আগে সকালে পিকেএসএফের সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও নির্বাহী পরিচালকদের মধ্যে যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছেন, তাদের সম্মাননা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে ১৮টি সহযোগী প্রতিষ্ঠানের ২২ জনকে এ সম্মাননা হিসেবে ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হয়। সকালের এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার মো. ফজলে রাব্বী মিয়া।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ১৩ শ্রাবণ ১৪২৩
২৮ জুলাই ২০১৬

শান্তির ওপর আক্রমণ মোকাবিলাই এখন বড় কাজ : অর্থমন্ত্রী

গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় বিশ্বব্যাংকের অবদান নেই

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেছেন, আমার আজীবন স্বপ্ন হলো শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ। সেই শান্তির ওপর আক্রমণ এসেছে। এটি মোকাবিলা করাই এখন সবচেয়ে বড় কাজ। গুলশানে হামলার পর সরকার দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনতে বেশ দৃঢ়তা দেখিয়েছে। কল্যাণপুরে পুলিশের গুলিতে ৯ জঙ্গি নিহত হওয়ার ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, আজকের (বুধবার) পত্রিকায় আপনারা তার নজির কিছুটা দেখেছেন। ভবিষ্যতে এই ধারা অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশের অগ্রগতি কেউ রুখতে পারবে না। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, যাবে।

গতকাল বুধবার পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ভবনে 'উন্নয়নে পিকেএসএফ ২০১৬ এবং সম্মাননা প্রদান' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় তিনি আরো বলেন, গ্রামীণ ব্যাংক ও পিকেএসএফ সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব সৃষ্টি। গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় বিশ্বব্যাংকের কোনো অবদান নেই। সে সময় ইফাদ শুধু এতে অর্থায়ন করে।

ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ তুলে ধরে অর্থমন্ত্রী বলেন, এর আগে রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হলেও সেই সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না। কিছুদিন পর আমি অবসর গ্রহণ করবো। পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ২

শান্তির ওপর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আমার অবসর গ্রহণ আনন্দপূর্ণ হবে। কারণ যেমন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলাম, তেমন বাংলাদেশ রেখে যেতে পারছি। তিনি আরো বলেন, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশ হবে। এখনকার তরুণরা সে সময় বুঝতে পারবে সরকারের রূপকল্প সঠিক ছিল। কিন্তু আমি বয়সের কারণে সে সময়টা দেখে যেতে পারবো না।

পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব ইউনুসর রহমান। তিনি বলেন, ক্ষুদ্র ঋণের সুদ হার ২৫ ভাগের বেশি হলেও দেশে চাহিদার মাত্র ৪৫ ভাগ ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। এর কারণও রয়েছে, ক্ষুদ্র ঋণের পরিচালন খরচ ১৮ শতাংশের বেশি। সেই সাথে রয়েছে মূলধন ব্যয়। এ জন্য ২৫ শতাংশের কম সুদে ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

সভাপতির বক্তব্যে পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, আমরা এখন উদ্যোক্তা তৈরিতে গুরুত্ব দিচ্ছি। শুধু ক্ষুদ্র ঋণ নয়, তাদের প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তি সহায়তাও দেওয়া হচ্ছে। পিকেএসএফ এখন বহুমুখি কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে গ্রামীণ জনকল্যাণ সংসদের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক জামিল চৌধুরীকে আজীবন সম্মাননা দেওয়া হয়। এছাড়া সাতক্ষীরা অঞ্চলে কাঁকড়া চাষে প্রযুক্তি হস্তান্তরে সহযোগিতা দেওয়ায় ভিয়েতনামের নাগরিক পাম থি হংকেও সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

এর আগে সকালে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের (এনজিও) সভাপতি ও চেয়ারম্যান ২২ মুক্তিযোদ্ধাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এ সময় প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার অ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বি মিয়া।

Page 8

The Financial Express

www.thefinancialexpress-bd.com

www.fe-bd.com /febdonline

Thursday, July 28, 2016

'Banks should balance collateral, low interest'

FE Report

Formal banking sector should find a balance between their collateral schemes and low interest rate to reach out to the grassroots-level people, who are mostly resorting to high interest microcredit schemes, the government policymakers opined on Wednesday.

"The interest rate for microcredit can be as high as 25 percent due to the administrative cost as well as the cost of capital involved in such schemes," said Banking Division Secretary Md. Eunusur Rahman.

Reaching out to grassroots people

He was speaking at an award-giving ceremony, organised by Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF) in the capital.

"Despite high interest rate, microcredit is in high demand, so much so that we are able to meet only 45 percent of its total demand," he added.

The Banking Division secretary observed that conventional banks are missing out the opportunity to reach out to majority rural population despite their excess liquidity and low interest rate.

"Currently, the conventional banks have excess liquidity and they are also offering loans at low interest rates. They are nevertheless unable to reach to a large segment of people, who are still resorting to microcredit despite its high interest."

Continued to page 7 Col. 1

'Banks should balance

Continued from page 8 col. 3

The Banking Division secretary noted that the absence of collateral in microcredit is a key reason. For this rural people are opting for microcredit while shying away from taking loans from conventional banks.

"Therefore, I have asked the state-owned banks to find a balance, so that they can explore this huge untapped market by offering low-interest loans to the rural people," he concluded.

Speaking on the occasion, Finance Minister A M A Muhith said over the last few decades, PKSF has made a significant contribution in spreading the benefits of microcredit to the country's rural people.

"PKSF was primarily established through domestic funding, and the organisation ran successfully without any overseas funding in its initial years. So this is a homegrown success," he added.

PKSF Chairman Dr. Qazi Kholiquzzaman Ahmad in his speech said the organisation is now widening its scope from small-scale credit to large-scale credit.

"Not only we are offering a wide range of microcredit schemes to the rural people, but we are also providing them with appropriate training as well as access to technology and market," he added.

Earlier, PKSF conferred lifetime award to the founder of Bangladesh Female Academy Jamil Chowdhury. At the same time, special award was given to Pam Thi Hong of Vietnam for introducing Vietnamese crab hatchery technology in Bangladesh.

Besides, a book titled "Bangladesh's Development Issues and Perspectives" was launched during the event. The book contains a number of essays on Bangladesh's development with special reference to Finance Minister A M A Muhith.

mehdi.finexpress@gmail.com

বৃহস্পতিবার ২৮ জুলাই ২০১৬
১৩ শ্রাবণ ১৪২৩
যুগান্তর

উন্নয়নের গতি থামাতে জঙ্গি হামলা

—অর্থমন্ত্রী

যুগান্তর রিপোর্ট